চাষের

বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১
জানুয়ারি ২০০৮

এনআরইজিএ
ও পশ্চিমবঙ্গ

চায়ের কথা

বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১
জানুয়ারি ২০০৮

•সূ•চি•

৩
কর্মনিশ্চয়তা আইন পরিচয়
৬
কথোপকথন মানব সেনের সঙ্গে
২২
কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ও পুরুলিয়া
৩৫
কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ও উ. দিনাজপুর
৩৭
একশো দিনের কাজে নতুন দিশা
৪৩
দুর্যোগ মোকাবিলায় NREGS

দিনের কাজ

সম্পাদক
সুব্রত কুন্ডু
সম্পাদনা সহযোগী
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
হরফ **শিপ্রা দাস** রূপ **অভিজিত দাস** মুদ্রাকর **লক্ষ্মীকান্ত নস্কর**

একশোদিনের কাজ চেয়ে
ঘরে এল অজস্র রাত্রি...

ললিত মেহতা
সোমাই গাগরাই
তাপস সোরেন

ঝাড়খণ্ডের এই তিন হত্যার নিন্দায়...

কর্মনিশ্চয়তা আইন ২০০৫

সাধারণ পরিচয়

মানব সেন

২০০৫ সালে এই আইন চালু হয়। আইনটির নাম ''জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন''। ইংরেজিতে National Rural Employment Guarantee Act। সংক্ষেপে NREGA। আইনে বিধান রয়েছে যে প্রতিটি রাজ্য এর মূলনীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে, স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে রাজ্যের উপযোগী আলাদা একটি নিয়মনীতি তৈরি করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গেও এই আইনকে ভিত্তি করে, সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দফতর একটি স্কিম চালু করেছে। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প নামে যা চালু আছে।

পটভূমি

আমাদের দেশে প্রায় সত্তর দশক থেকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসাবে, সব রাজ্যে দুটি মূল ধারার কাজ হত। একটিকে বলা হত শ্রমের বিনিময়ে মজুরি (Wage Employment) অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম করে মজুরি পাওয়া। স্বাধীনতার পর থেকেই এই ধরনের প্রকল্প কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বহুদিন ধরে চলে আসছে। এটা একটা ধারা। জাতীয় কর্মসংস্থান যোজনা (National Employment Scheme)-এর এটা প্রথম ধারা।

দ্বিতীয় ধারাটি হল সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট বা স্ব-নিযুক্তি কর্মসংস্থানের ধারা। যারা নিজেরা দল তৈরি করে কর্মসংস্থান তৈরি করবে। যেমন সহায়ক দল তৈরি করা এবং রোজগার করা। যারা এক একটি উদ্যোগ তৈরি করবে, রোজগার করবে বা কর্মসংস্থান করবে। প্রায় তিরিশ বছর ধরে চলছে এই ধারার কাজ।

১৭৮৯ সালে ইংরেজ এদেশে রিলিফ কোড চালু করে। ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতবর্ষে দুটি জিনিসের মুখোমুখি হত – একটা মন্বন্তর আর অন্যটি অনাহার। অনাহারে প্রাণহানি হলে, ভারতের প্রশাসনকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জবাবদিহি করতে হত। তাই এই রিলিফ কোড। তারা দেখেছিল ভারতবর্ষের গ্রামীণ জীবনধারা কৃষির সঙ্গে জড়িত। কৃষিতে একজন মানুষ সবসময় কাজ পায়না। ক্ষেত্র বিশেষে ৭০-৮০ দিন বা আরও কম পায়। বড়জোর খুব বেশি হলে ১৬০ বা ১৮০ দিনের কাজ হয়। কৃষিতে যদি কাজ না থাকে, তাহলে তাদের বিশেষ করে খেতমজুরদের খাদ্যের অভাব হয়। এই খাদ্য সংকট ১ মাস থেকে ৩ মাস পর্যন্ত তীব্র থাকে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬১ তম রাউন্ডে বলা হয়েছে, ভারতবর্ষে যে সব মানুষ গ্রামে বাস করে তার ১০% এখনও পর্যন্ত বেশ খাদ্য সংকটে ভুগছে। তাহলে আমরা দেশের জনসংখ্যার ১০% মানে ২ কোটি পরিবারে তীব্র থেকে তীব্রতর খাদ্য সংকট আছে।

দু ধরনের রিলিফ ছিল - এক বৃদ্ধবৃদ্ধা (যারা ফসল ফলাতে পারে না) তাদের জন্য

খয়রাতি রিলিফ আর টেস্ট রিলিফ। দিঘি, পুকুর কাটা, রাস্তা তৈরি করা এই টেস্ট রিলিফ-এর মাধ্যমে হতো। যখন দেখা যেত গ্রামে ভাতচুরি হচ্ছে তখন এই রিলিফ দেওয়া শুরু হত। মাটি কাটার কাজ হত। ১-২ মাস অনেক মানুষ কাজ করত। আস্তে আস্তে এই সংখ্যা ৫০-২০তে এসে দাঁড়াত। এই কুড়িতে নেমে এলে টেস্ট রিলিফ বন্ধ করা হত। খাদ্য সংকট রোঝার জন্য এই রিলিফ বলে একে টেস্ট রিলিফ বলা হত।

স্বাধীনতার পর এই ছবির বদল হল। গর্ত খোঁড়ার কাজ বন্ধ হল। জোর পড়ল স্থায়ী সম্পদ তৈরিতে। যা স্থায়ী আয়ের সংস্থান করবে। এই আইনের পেছনে ছিল মহারাষ্ট্রের খেতমজুরদের কাজ পাওয়ার আন্দোলন। এই আইন চালুও হয়েছে মহারাষ্ট্রেই প্রথম।

বৈশিষ্ট্য

১. অধিকার অর্থাৎ কাজের অধিকার
২. স্থায়ী সম্পদ তৈরি। এই সম্পদের বেশিরভাগই কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কাজ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। যেমন পুকুর খনন, সেচ, বনসৃজন ইত্যাদি।

দক্ষতার নানা ভাগ আছে — যে মজুর বা শ্রমিক কাজ জানেন না তিনি অদক্ষ শ্রমিক, ওলোন ধরতে জানেন যিনি তিনি অর্ধদক্ষ, যিনি সব কিছুই জানেন তিনি দক্ষ। আবার যে শ্রমিক খাতাও লেখেন মাটিও কাটেন তিনি অর্ধদক্ষ। তবে NREGA-এর কাজটি মূলত অদক্ষ শ্রমিক তথা খেতমজুরদের জন্য।

কাজ পাওয়ার নিয়ম—

কাজ পেতে হলে আগে জব কার্ড পেতে হবে। জব কার্ড পরিবারের নামে হবে। কোনো একটি পরিবারের ১০০ দিনের কাজ পাওয়া বলতে বোঝাবে সকল কর্মক্ষম সদস্য মিলে ১০০ দিনের কাজ। জব কার্ড কোনো ব্যক্তির নামে আলাদা করে হবে না।

প্রথমত, নিয়মানুযায়ী আবেদন অবশ্যই করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আবেদন গ্রহণ করা হলে একটা রসিদ আবেদনকারীকে দফতর থেকে দেওয়া হবে। রসিদটি আবেদনকারীর কাছে থাকবে। তৃতীয়ত, আবেদন গ্রহণ করার পর কাজ না পেলে, অভিযোগ জানাতে হবে।

অভিযোগ জমা পড়বে প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে। প্রোগ্রাম অফিসারের কাজ করেন সমষ্টি আধিকারিক (বিডিও)। ১৫ দিনের মধ্যে যদি এই আধিকারিক কোনো কাজ দিতে না পারেন, তাহলে তা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরকে জানাতে হবে। জেলা শাসক হলেন প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর। আইন অনুযায়ী ১৮-৫০ বছর বয়স্ক যে কোনো কর্মক্ষম মানুষ যদি কাজ করতে চায়, তাহলে তাকে কাজ দিতে হবে। আইন আরও বলছে যে রেশন কার্ড বা ভোটার পরিচয়পত্র না থাকলেও এই কাজ পাওয়ার অধিকার থাকবে। এমনকি বিপিএল আওতায় নেই, কিংবা অন্য কোনো কাজে ইতিমধ্যে নিযুক্ত, তাহলেও এই কাজ পাওয়ার অধিকার থাকবে। কোনোরকম লিঙ্গ বিভেদ বা লিঙ্গ পক্ষপাত থাকবে না। আবেদন করে কাজ না পেলে রাজ্য

বিপিএল আওতায় নেই, কিংবা অন্য কোনো কাজে ইতিমধ্যে নিযুক্ত, তাহলেও এই কাজ পাওয়ার অধিকার থাকবে

কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা সংসদ (State Employment Guarantee Council) আছে, যেখানে এই নিয়ে মামলা করা যাবে।

কাজ কোথায় হবে তা পঞ্চায়েত ঠিক করবে। পঞ্চায়েতকে তার ৫ কিলোমিটারের মধ্যে কাজ দিতে হবে। যদি পঞ্চায়েত পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে কাজ দিতে না পারে, তাহলে কাজ দূরে হবে। সেক্ষেত্রে মজুরি বাড়বে। নির্দিষ্ট পঞ্চায়েত কাজ দিতে না পারলে অন্য পঞ্চায়েত কাজ দিতে পারবে। সেটা ঠিক করবে সমষ্টি আধিকারিক।

মাটি কাটার কাজ

মাটি কাটার পাঁচ রকমের ভাগ রয়েছে। আলগা নরম মাটি, সাধারণ মিশ্র মাটি, মিশ্র কিন্তু শক্ত মাটি, শক্ত মাটি, কর্দমাক্ত এঁটেল মাটি অর্থাৎ পাঁক মাটি। সাধারণত ৫ ফুট পর্যন্ত মাটি ফেলতে হবে। মাপের ব্যাপারে আছে দুটি জিনিস। একটি হচ্ছে 'Lead' অর্থাৎ কত দূর পর্যন্ত মাটি কাটা হচ্ছে। এটা প্রায় ৫ ফুট পর্যন্ত। অন্যটি হচ্ছে 'Lift' অর্থাৎ মাটি কতটা তোলা হচ্ছে। ◻

ডিআরসিএসসি-র বোসপুকুর অফিসে অনুষ্ঠিত কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন শীর্ষক আলোচনাসভার সভাবয়ানের লেখাসংক্ষেপ

প্রতিবেদন : **শুক্লা দেব (মিত্র)**

কথোপকথন

মানব সেন
প্রযত্নে
ডিআরসিএসসি

পশ্চিমবঙ্গে NREGS-এর ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে বললেন শ্রী মানব সেন। শ্রী সেন কৃতী গ্রামোন্নয়ন গবেষক। দীর্ঘসময় রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থায় শীর্ষ বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয় ৫ নভেম্বর ২০০৮-এ।

লেখাটিতে অনুগ্রহ করে এক বক্স (□) বসানো অংশ 'প্রশ্ন' ও দুই বক্স (□□) বসানো অংশ 'উত্তর' ভেবে পড়বেন

□ রোজগার আইনের মেয়াদ শেষ হতে আর এক বছর। মাটি কাটার কাজ পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। কিন্তু আইন অনুযায়ী কাজের অন্য ক্ষেত্রগুলোয় (যেমন বনসৃজন-সেচ ইত্যাদি) সেভাবে সাড়া পড়েনি। এই একবছরে কীভাবে করা যেতে পারে সেই কাজ মানবদা আপনার কী মনে হয়?

□□ ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি বা অদক্ষ শ্রমিকের কাজ পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত হওয়ার মূল যে দুটো উদ্দেশ্য ছিল যার একটা, যেসব পরিবারের সক্ষম সদস্যরা কায়িক পরিশ্রম করে শ্রমভিত্তিক কাজ করতে চায়, তারা যেন ১০০ দিনের কাজের সুযোগ পায়...এই উদ্দেশ্য আজকে নতুন নয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-অর্থনীতির প্রায় সম্পূর্ণভাবে বা খুব বড় অংশ এখনো কৃষির উপর নির্ভরশীল। আর এটা সবাই জানেন যে, যে সব এলাকায় সেচের সুবিধা নেই মূলত এক ফসলি চাষ, সেইসব এলাকায় খেতমজুরের কাজ সারা বছরে ৭০-৭২ দিনের বেশি পাওয়া যায় না। বাকি সময়টা হয় তাদের অন্য জায়গায় কৃষি ছাড়া অন্য শ্রমের কাজ করতে হয়, অথবা গৃহভিত্তিক কিছু কিছু হাতের কাজ করতে হয় রোজগারের জন্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি ঘটনা ঘটছে যার কথা বুঝলে আমরা ১০০ দিনের কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারব। এক হচ্ছে, গ্রাম থেকে কাজের জন্য অন্যত্র যাওয়া (অন্য রাজ্যে-জেলায়) পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতেই অনেক বেশি বেড়ে গেছে। দ্বিতীয়ত লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রতিবছর অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। গত ২০০৬ সালে যে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা হয়েছিল, তার থেকে তথ্য পাচ্ছি যে ৫১ ভাগের বেশি পরিবার এখন খেতমজুর।

□ এটা হওয়ার কারণ কী

□□ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, নানা কারণেই তাদেরকে ভূমি থেকে — চাষ থেকে সরে যেতে হচ্ছে। তার জন্য অবশ্যই অর্থনৈতিক কারণটা প্রধান — যেমন ধরুন, যদি রুজিরোজগার না থাকে, তাহলে সংসার চলাবার জন্যই জমি বন্ধক বা লিজে দিয়ে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হয়। যদিও এখনো এই বাংলায় খাই খালাসি বা ফসলের কিছু অংশ ভাগে দিয়ে চাষ করার ধরনের বেশ চল আছে। এখানে বলে রাখি যে, এই চাষ যারা করছে তার মধ্যে নথিভুক্ত বর্গাদারের পাশাপাশি নথি-বর্হিভূত, কেবল মৌখিক চুক্তি বা মুখের কথায় ঠিক হয়ে চাষ করছে এই সংখ্যাটা খুব কম নয়। তা সত্ত্বেও কিন্তু চাষে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না। যেখানে গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা চাষ, যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ যদি না বাড়ে সেক্ষেত্রে গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে গ্রামেই কাজের সুযোগ বাড়ানো খুবই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। এই কাজের সুযোগ তৈরির উপায় কিন্তু এই প্রকল্প এনে দিয়েছে। ... এখানে বলা দরকার যে, সব জেলাতেই যে এই প্রকল্পের কাজ পঞ্চম বছরে বছর পড়েছে তা কিন্তু নয়। কোনা কোনো জেলাতে এই প্রকল্পের বয়স কেবল দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছর।

□ এটা কীভাবে হল

□□ আসলে প্রথমে এটা শুরু হয়েছিল, কয়েকটা নির্দিষ্ট ব্লক—পিছিয়ে পড়া ব্লকে, যেখানে আগে Food for Work কার্যক্রম চলছিল—তারপর এটা পিছিয়ে পড়া দশটা জেলায় নেওয়া হল। এভাবে ১ এপ্রিল ২০০৭-এ প্রকল্পটি সারা পশ্চিমবঙ্গের (কলকাতা ছাড়া) জন্য কার্যকারী হয়। তবে হাওড়ায় কাজ শুরু হয় ১ এপ্রিল ২০০৮-এ।

□ তাহলে আইনে এই পাঁচ বছরটা আপেক্ষিক

□□ আইনে বলা আছে কাজটা পাঁচ বছর চলবে। মনে হয় আইনে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, সরকার হয়তো দেখতে চায়, পাঁচ বছরে এই প্রকল্প কতটা তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে, আর কিছু সুযোগসুবিধা বাড়াতে হলে, কীভাবে সরকার তা বাড়াবে সেটাও দেখতে পারে, কিংবা এই বিশাল সংখ্যার কাজের সুযোগ তৈরির জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার সংস্থান কোথা থেকে হবে, সেটাও সরকার দেখতে পারে। এভাবে আমার মনে হয়, আইনটা তৈরির সময় এরকম একটা মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করার কথা ভাবা হয়েছিল।

□ মানবদা এখানে একটা কথা জানার যে, যদি পশ্চিমবঙ্গে কোথাও এই প্রকল্পের কাজ ২০০৭-এ শুরু হয়, সেক্ষেত্রে কি আরো পাঁচ বছর পাওয়া যাবে।

□□ আইন যেটা লোকসভায় গৃহীত হয়েছে সেটাতে বলা হয়েছে ২০০৫ থেকে পাঁচ বছর। মানে আমরা মোটামুটি ধরতে পারি ২০১০-২০১১ আর্থিক বছর পর্যন্ত এর মেয়াদ। কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি, এটা একটা অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা। কারণ গ্যারান্টি যদি আইন করে দেওয়া হয়, তবে তা সময় দিয়ে বেঁধে দেওয়া যায় না। আমি আরও যেটা বলতে চাইছিলাম যে, এখানে কাজের সুযোগ বাড়ানো যেমন দরকার, তেমনি এই প্রকল্পে শ্রম দিয়ে যে সম্পদগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো যেন এমন একটা স্থায়ী সম্পদ হয় যার থেকে ধারাবাহিক আয়ের একটা সুযোগ বাড়ে।

□ মানে Sustainable

□□ হ্যাঁ। যেমন, যদি সেচের ব্যবস্থার কথা বলেন তাহলে গ্রামে ব্যক্তিগত, যৌথ মালিকানায় যে সব মজা পুকুর আছে, সেসব পুকুরের জল পুকুর মালিকরা যদি সবার সেচের জন্য দিতে রাজি থাকে তবে এইসব পুকুর কাটা বা সংস্কার করা এই প্রকল্পের আওতায় পড়বে। এই পুকুরটা একটা বড় সম্পদ। এই পুকুরটা ঘিরে জীবিকার স্থায়ী ব্যবস্থা অনেক কিছু হতে পারে। ...যেটা আপনারা অনেক সময় পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন গ্রামের মানুষকে। যে পুকুরকে ঘিরে সমন্বিত চাষ অর্থাৎ পুকুরের ঢালে চাষ, পুকুরের পাড়ে চাষ। মাচা করে চাষ, জলে মাছ-হাঁস তার সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি যদি প্রাণীপালন করা যায়, তাহলে আমরা যাকে বলি জীবচক্র সেটা হতে পারে, প্রকৃতি-নির্ভর চাষ হতে পারে। তবে কেবল আমাদের দেশে নয়, এশিয়ায় বহু দেশেই এই ধরনের চাষের প্রচলন আছে।

□ মুলত প্রান্তিক পরিবারগুলোর জন্য

□□ হ্যাঁ, মূলত প্রান্তিক পরিবারগুলোর জন্য এবং সেটা কিন্তু দেখাও গেছে খুব ফলদায়ী। অর্থাৎ পুকুরটা যদি ভালো থাকে, তবে তাকে ঘিরে যেসব জীবিকা সেটা কিন্তু চাষের উপর যারা নির্ভরশীল তাদের একটা স্থায়ী সুযোগ দিতে পারে। এই পুকরের পাশাপাশি অনেকগুলি জেলায়, যেমন ধরুন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম-বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে যেসব উঁচু ডাঙা জমি আছে, যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয় বা বৃষ্টি সবসময় হয় না, অনিশ্চয়তা থাকে, সেইসব জায়গায় কিন্তু অনেক জমি এখনো পতিত আছে। আপনারাও দেখিয়েছেন যে, এই পতিত জমিগুলোকে যদি একটু উন্নয়ন করা যায়, ...মানে ভূমি উন্নয়ন সেখানে আমরা বলি—যেটা এই কাজে প্রাধান্য পাওয়া উচিত, জলবিভাজিকার ধারণাটা নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে এই ধরনের জমিতে আমরা অনেক সম্পদ তৈরি করতে পারি। যেসব জায়গায় মাটিতে জলধারণ ক্ষমতা কম, সেখানে জল কম লাগে এরকম চাষ যেমন, ডাল,

পুকুরের জল পুকুর মালিকরা যদি সবার সেচের জন্য দিতে রাজি থাকে তবে এইসব পুকুর কাটা বা সংস্কার করা এই প্রকল্পের আওতায় পড়বে

তৈলবীজ এগুলো করা যেতে পারে। আবার একটু উঁচু যে ডাঙা জমিগুলো, যেখানে ধরুন কিছু কৃষিবন বা ঘাসজাতীয় কিছু করা কিংবা রেশম শিল্পের চাষ। অর্থাৎ জমির অবস্থা যাই থাক, তার কিছু উন্নয়ন ঘটাতে পারলে সেই জমিটাকে ব্যবহার করা যায়। এই সুযোগ কিন্তু আবার অনেক জেলায় নেই। এটা আবার পশ্চিমবঙ্গের একটা অসুবিধে। যেসব জায়গায় সেচের সুবিধে বেশি রয়েছে — কৃষি-নিবিড় এলাকা, সেখানে কিন্তু জমি পাওয়া বা মাটির কাজ করার সুযোগ কম...যেখানে সারাবছর কিছু না কিছু চাষ হয়। তবে সেসব জায়গায় এমন অনেককিছু করা যায় যাতে চাষ সুস্থায়ী হয়। যেমন সেখানে অনেক খাল আছে, নদী আছে, জলাধার আছে যেগুলো বুজে গেছে-মজে গেছে, যেগুলো নিচু এলাকা সেখানে বাঁধগুলো হয়তো শক্ত নেই, ফলে বন্যার সময় জল ঢুকে ফসলের ক্ষতি করে — এই কাজগুলো এই NREGS দিয়ে করা যেতে পারে। এই কাজগুলো তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। — মানে আমরা একটা পুরোনো প্রচলিত ধারায় চলি, সেই ধারা থেকে পাল্টাতে হয়তো কোথাও মানসিকভাবে আমাদের অসুবিধা হয়। আমাদের মনে হয় যেন, মাটি কাটার কাজ মানেই রাস্তা করা। এটাও দেখছি যেন রাস্তা করার কাজটা একটু বেশি হয়েছে। ... তার মানে — নতুন ভাবনা কিছু আনা দরকার। নতুন ভাবনা শুধু পঞ্চায়েত স্তরে হবে না — এই কাজগুলোর আবার একটা সাংগঠনিক প্রক্রিয়া আছে — তার রেকর্ডপত্র রাখতে হয়...হিসেবপত্র রাখতে হয়...তার নানারকম এস্টিমেট করতে হয়...প্ল্যান করতে হয়...এখন আমরা যেহেতু এই ধরনের কাজ বেশি করেছি মানে আমাদের রাস্তার কাজ — বাড়ি করার কাজ ... বা পুকুর কাটার কাজগুলোয় প্ল্যান বা এস্টিমেট করতে সুবিধা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে একটা জঙ্গল তৈরি করব...

□ ভাবিইনি কখনো...

□□ হ্যাঁ...আমি রাস্তার ধারে গাছ লাগাব কখনো ভাবিনি। আমি ওয়াটারশেড করব এটা কখনো ভাবিনি —তা এই ভাবনার কিন্তু একটা জায়গা রয়েছে...এই ভাবনাটা ভাবতে...।

□ সময় লাগবে

□□ সময় যে লাগবে তা নয় — আমি মনে করিনা গ্রামের মানুষরা এগুলো ভাবেন না। কিন্তু আমরা বলব ব্যবস্থাটা আমাদের এমন, যে ভাবনাটা তো শুধু গ্রামের মানুষকে ভাবলে হবে না। ... ধরুন পঞ্চায়েত খুব বেশি মাত্রায় সরকারি আদেশ-নির্দেশ তাদের কথামতো চলা, এটা একটা এমন নির্ভরশীলতার মধ্যে চলে গেছে...যে পঞ্চায়েত যে স্থানীয় সরকার, সে যে নিজে ভাবতে পারে, সে নিজে করতে পারে...এটা স্থানীয়

সরকার, তৃতীয় সরকার —— তার নিজের ক্ষেত্র আছে — তার কিছু স্বাধীনতা আছে—সে কিছু অর্থ পেতে পার...তার স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী...এই ভাবনাটা খুব বেশি এখনো কাজে লাগেনি আর কি! কার্যকারী হয়নি। এই একটা বিষয় আছে ভাবনা, এই ভাবনাটা আমি কেন বলছি, যে ধরুন যে সব প্ল্যান-এস্টিমেট অনুযায়ী পঞ্চায়েত কাজ করে সেগুলো ছাপানো বই আছে। এর একটা সুবিধা হয় কি ছাপানো বই থাকলে সেই বইটা দেখে দেখে একটা স্কিম তৈরি করতে, যারা একেবারে নীচের স্তরের কর্মী তাদের সুবিধা হয়। কিন্তু আবার যদি আপনি নতুন কোনো ভাবনা দেন, তাহলে আপনার ওই স্কিমগুলোকেও নতুন করে বেঁধে তৈরি করা দরকার। তাই ওপরের স্তর-নীচের স্তর-মাঝখানের স্তরে সবস্তরেই ভাবনা না থাকলে হবে না। এমন কি রাজ্যস্তরেও ভাবা দরকার যে, আমরা বনসৃজনের জন্য কী ধরনের প্ল্যান-এস্টিমেট তৈরি করব, আমি যদি কৃষিবন তৈরি করি তার জন্য কেমন প্ল্যান -এস্টিমেট তৈরি করব...আমি যদি, ভাবনাটা নতুন করে এরকমও ভাবতে পারি যে আমরা তো অনেকসময় বর্ষার সময় কাজ দিতে পারিনা...সেই সময় আমরা যদি অন্য কিছু মাটির কাজ করতে পারি যেমন আজকালতো অনেক জায়গায় কাঁচামাটি থেকে পুড়িয়ে ইট তৈরি হয়, এই যে ভাবনাটা...এটা কিন্তু এখনো সরকারি স্তরে খুব দানা বাঁধেনি। সরকারি স্তরে এই ভাবনাগুলোরই বিরাট রকম পরিবর্তন না হলে কিন্তু, গতানুগতিক ধারার মধ্যে এটা পড়ে যাচ্ছে। গতানুগতিক ধারার অসুবিধে হচ্ছে কি, সেখানে ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়ার মতো কাজ করার সুযোগ আপনি হয়তো সব জায়গায় পাবেন না। যদি না আপনি নতুন করে ভাবতে পারেন, নতুন করে পরিকল্পনা করতে পারেন, বা নতুন করে তার জন্যে ইঞ্জিনিয়ারিং - এস্টিমেট করা ইত্যাদির কথা ভাবতে না পারেন।

□ সেটা হয়েওছে যে, কাজ পাওয়া যাচ্ছে না

□□ সেখানে আমি যেটা বলব, আমাদের অনেক কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ...মানে আবার নতুন করে ভাবতে হবে..

□ মানবদা মাঝখানে বলি, পঞ্চায়েতের কাছে ছাপা এই যে সবকিছু আছে, সেক্ষেত্রে যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকল্পটা তৈরি করল–তার একটা করে প্রতিলিপি তো পঞ্চায়েতের কাছে আছে।

□□ আছে...মানে তুমি যে কাজগুলো করবে, তার একটা শিডিউল করে দেওয়া আছে, তাকে বলা হয়েছে যে তুমি ওই শিডিউল অনুযায়ী প্ল্যান-এস্টিমেট তৈরি করবে। কিন্তু সেই

অনেকসময় বর্ষার সময় কাজ দিতে পারিনা...সেই সময় আমরা যদি অন্য কিছু মাটির কাজ করতে পারি যেমন আজকালতো অনেক জায়গায় কাঁচামাটি থেকে পুড়িয়ে ইট তৈরি হয়, এই যে ভাবনাটা...এটা কিন্তু এখনো সরকারি স্তরে খুব দানা বাঁধেনি

শিডিউলেতো এই কাজগুলোতে নেই। তাহলে তো শিডিউলটা আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে।

□ কর্মীদেরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। কর্মী ভাবছেন, এটা করলে ঠিক করা হবে...

□□ নিশ্চই। তাকে তো বলা হচ্ছে যে তুমি শিডিউল অনুযায়ী প্ল্যান-এস্টিমেট তৈরি করো।

□ মানে ওপর থেকে বলতে বলতে আসা দরকার, আর কি

□□ ধারণাটা ওপর থেকে বদলাতে হত না, যদি পঞ্চায়েত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত। কিন্তু যেহেতু পঞ্চায়েত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, তারা পুরো নির্ভরশীল সরকারের ওপর; সুতরাং ওপরের ধারণাটা যা সেই অনুযায়ী তাদের চলতে হয় —

□ মানবদা একটু পরিষ্কার করি ধরুন আমি কাজ করতে চাই—আমার জব কার্ড আছে। কিন্তু আমার কাছে কি পরিষ্কার যে আমি কতদিন পর্যন্ত কাজ করতে পারি—আমি জানি আইনটা ২০০৫-এ পাশ হয়েছে—তারপর প্রকল্প হয়েছে। আমার কাছে আর কতবছর সময় আছে কাজ পাওয়ার

□□ জব কার্ড নিয়ে যেটা বলার কথা, তা হল জব কার্ড পাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ভালো হয়েছে। অন্য রাজ্যের তুলনায় খারাপ না, বরং ভালোই বলতে পারি... যে যতজন আবেদন করেছেন তার শতকরা ৯০ ভাগ বা তার বেশি জবকার্ড পেয়েছেন। আর যাঁরা জবকার্ড পেয়েছেন তাঁরাও যদি কাজ পেতেন, তাহলেও আমরা একটা বড় সাফল্যলাভ করতে পারতাম...দুর্ভাগ্য যে সেখানেও কোনোবছর ১৫-কোনো বছর ২১-কোনো বছর ১২ এরকম আমরা ১০০ দিনের মধ্যে কাজ দিতে পেরেছি। এটাকে যদি আমি ৫০ দিন করতে পারতাম, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, পশ্চিমবঙ্গের গরিবদের বিশেষ করে যারা খেতমজুর, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতই...এবং ছোটোখাটো গবেষণার যে কাজ আমি করি তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এমনকি যে সব এলাকায় খাদ্যের অভাব আছে, সেইসব এলাকায় যদি তাঁরা ১৫ দিনের কাজ পেয়েছেন, তবে তাঁরা এই ১৫ দিনের কাজ পাওয়ার জন্য একমাসের খাদ্য জোগাড় করতে পেরেছেন...এবং এই একমাস তাঁদের বাইরে যেতে হয়নি। এই বড় দিকটা না ভাবলে এনআরইজিএ যাঁরা করেন, তাঁদের ভাবনার পরিবর্তন হবে না— যে আমরা কাঠামোটাকেই পাল্টে দিতে পারি, যদি আমি এইটা ভালো করে করতে পারি। সেজন্যই বলছিলাম, ৫০ দিন পর্যন্ত যদি যেতে পারি তাহলে কিন্তু আমি নিচের তলার মানুষদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে পারি—এবং এছাড়া আমাদের কাছে কোনো বিকল্পই নেই।...এবার যেটা

বলছিলেন, যারা জবকার্ড পেয়েছে তারা কি জানে ক বছর পর্যন্ত চলবে...আমি এই জানার ব্যাপারটা বলছি, যে জবকার্ড দেওয়ার ব্যাপারটা আমাদের এখানে কাজগুলো সেভাবে হয়...সেটা অনেকটা ওই আন্দোলনের আকার আর কি...একটা সময় সবাই জবকার্ড দিতে হবে বলে আন্দোলনের আকারে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইবার আমি আপনাকে বলি যে...মানে যে তথ্যগুলি পাচ্ছি গবেষণা থেকে যে, শতকরা আশিভাগ জানেনা যে একটা আবেদন করতে হয় কাজ পেতে গেলে...একটা ৪ এর ক ফর্মে আবেদন করতে হয় এটা জানে না। এটাও সরকারি নির্দেশে বলা আছে যে ৪-ক ফর্মে কেউ যদি আবেদন করতে না পারে, তাহলে পঞ্চায়েত তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু অনেক জায়গাতেই জানে না যে আবেদন করতে হবে...যে কারণে আবেদন কম হয়েছে, আবার আবেদন করার সময় অনেক বাধা আছে...যখন আবেদন করতে গেলে, সাধারণত গ্রামের খেতমজুর পরিবার তাকে যদি পঞ্চায়েত অফিসে আসতে হয়, তাহলে তার একদিনের মজুরি চলে যায়। এটা তার পক্ষে অত্যন্ত হয়রানি হয়, আবার তাকে বলা হয় যে এখন কাজ হচ্ছে না, ফর্ম নেই এরকম কথা যদি তাকে বলে দেওয়া হয়, তখন তারা খুব নিরুৎসাহ বোধ করে। আমাদের কর্মী যাঁরা আছেন বা পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের কিন্তু এই ব্যাপারটায় খুবই সংবেদনশীল ও সক্রিয় হওয়া দরকার। আমরা একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলি যে, মহারাষ্ট্রে তো অনেকদিন ধরে এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম চলছে, সেখানে কিন্তু একটা সামাজিক—রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এটা এসেছিল।

□ প্রথম বলবত হয় ওখানেই

□□ হ্যাঁ, ওদের ৩০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা... যদিও এখন ততটা ভালো করতে পারছে না। কিন্তু ওরা যেটা করছিল তার পেছনে একটা সামাজিক — রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল... সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া যেমন এই যে মানুষকে বোঝানো – তাকে সচেতন করা-তার ফর্মটা ফিলাপ করে দেওয়া —তাকে নিয়ে গিয়ে পঞ্চায়েত থেকে ফর্ম সংগ্রহ— পঞ্চায়েতকে সাহায্য করা...বলা যে আপনাদের যদি খাতাপত্র লিখতে অসুবিধা হয় আমাদের বলুন আমরা লিখে দিচ্ছি। এইটা ছাড়া...মানে এই আন্দোলন ছাড়া...এই যে আমি বললাম—৫০ দিনের কাজ দিয়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসার কথা, সেটা সম্ভব না...অর্থাৎ একটি সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া কাজটি এগোবে না বলে আমার মনে হয়। — এই আন্দোলন বলতে জড়ো হওয়া, চেঁচামেচি করা সে অর্থে বলছি

এটাও সরকারি নির্দেশে বলা আছে যে ৪-ক ফর্মে কেউ যদি আবেদন করতে না পারে, তাহলে পঞ্চায়েত তাকে সাহায্য করবে

না। আন্দোলন বলতে একটা নাড়াচাড়া দেওয়ার কথা বলছি। নাড়াচাড়া মানে-রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক সংগঠন এমন কি যাঁরা সমাজকর্মী -ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেন, সবাই মিলে যদি ভাবটা যে এটা সবার কাজ, কাজ করে গ্রামটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব যাতে গ্রামটার একটা অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসে...তাহলে জিনিসটা সম্ভব। এখন ফিরে যাই আপনার প্রশ্নে...পাঁচবছর পর এটা থাকবে কি থাকবে না, সেটা জানার তো কোনো সুযোগই নেই — কারণ সে তো জানেই না যে, কাজ যদি পেতে হয় তাহলে আবেদন করতে হবে...সুতরাং এইটা আমি বরঞ্চ বলব যে, এই প্রচারটা জব কার্ড পাওয়ার জন্য যে রকম করা হয়েছিল, কাজটা পাওয়ার জন্য — আবেদন করার জন্য সেই ধরনের লাগাতার প্রচারাভিযান নেই।...প্রচারাভিযান নেই এটা একটা দিক—কিন্তু যারা কাজটা করবে, তাদের ওই কাজটা করার মতো প্রাক্-প্রস্তুতি দরকার। সেদিন এলে হবে না, একবছর আগে আমাদের ভাবতে হবে গ্রামে আমরা কী কী কাজ করতে পারি...প্রতি মাসে কী কী কাজ করতে পারি

□ এটা গ্রামের মানুষকে ভাবতে হবে

□□ এটা গ্রামের মানুষকে ভাবতে হবে প্রত্যেকটি কাজের পরিকল্পনা, সংসদ থেকে আসার কথা। সংসদ বসার দিন এই পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনাটা করতে গেলে আবার সেই...গ্রামের মানুষ, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি— রাজনৈতিক সংগঠন-সামাজিক সংগঠন, সমাজকর্মী সবাই মিলে যদি তিনমাস আগে পরিকল্পনা তৈরি করি তবেই সম্ভব।

□ আচ্ছা মানবদা, আপনিতো ভীষণভাবে গ্রামে কাজ করেন তো আপনি কি ...মানে আপনার কাছে কি এমন উদাহরণ আছে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এরকম কাজ করেছে ...সবাই একসঙ্গে গ্রাম সংসদে বসার আগে পরিকল্পনা করেছেন ...একটা দুটো উদাহরণ ...কিছু উদ্যোগ...

□□ আমি দু-একটা উদ্যোগের কথা বলব...যদিও সেই ধরনের দৃষ্টান্ত কম — উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের জয়হাট বলে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। যেখানে আমরা পঞ্চায়েতকে কিছু সহায়তা দিই এইসব কাজ করার ব্যাপারে। যেখানে অনেক আগে থেকেই ন্যাশনাল ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম চলছিল...ফলে ১০০ দিনের কাজের ব্যাপারটা ওরা জানত। কিন্তু এরাও, খুব বেশি দিনের কাজ দিতে পারেনি। কারণ ভাবনার কিছু অভাব ছিল...সেখানে আমরা ওদের ভাবালাম যে, আমরা কতগুলো কাজ করব এবং একবছর আগে থেকে যদি ভাবি, কাজ করব—— এবং আমরা যদি গ্রামের মানুষকে পাড়ায় পাড়ায় বসে আলোচনা করে যদি ভাবাই এবং তার পরে যদি পরিকল্পনাটা তৈরি করি সংসদে...সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে (উ.

দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের জয়হাট গ্রাম) একটি বছর তারা প্রায় দু-কোটি টাকার মতো কাজ করতে পেরেছিল এবং এর মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার কাজ স্বনির্ভর দল দিয়ে করতে পেরেছে আর এই কাজের প্রায় অর্ধেক কাজ হয়েছে বনসৃজন ও পুকুর সংস্কারের। ফলে কয়েকটা জিনিস আমরা দেখতে পেলাম সেখানে ঘটেছে–– পঞ্চায়েতের সঙ্গে গরিব মানুষের, বিশেষ করে স্বনির্ভর দলের মেয়েদের যোগাযোগ খুবই বেড়েছে...কারণ সেখানে তারা পঞ্চায়েতের কাজের অংশীদার হয়েছে। এক একটা সময় যখন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আমি যেতাম — তখন ওখানে দুশো থেকে আড়াইশো মহিলা এইসব কাজের জন্য আসতেন। কেউ চারা নিচ্ছেন, কেউ হয়তো কাজের জন্য একটা অর্ডার নিয়ে যাচ্ছেন – পুরো কর্মচঞ্চল পঞ্চায়েত আমরা পেয়েছিলাম, যে পঞ্চায়েতে এই প্রকল্পের কাজের প্রায় ৫০ ভাগের ওপর মহিলারা করেছেন...এবং যে কাজগুলো করেছেন সেগুলো স্থায়ী সম্পদ তৈরি করতে দারুণ সহায়তা করেছে। বরঞ্চ অসুবিধেই হয়ে যায় যে, যদি খুব বেশি চারা তৈরি করে ফেলে, মানে আগাম পরিকল্পনা যদি না থাকে কোথায় লাগাব, তাহলে আবার জায়গা খুঁজে পেতে খুব অসুবিধে হবে। অর্থাৎ সবটাই নির্ভর করে আগাম পরিকল্পনা কতদূর ঠিকঠাক হবে তার ওপর।

□ আচ্ছা মানবদা এখানে পরিকল্পনা তৈরিতে গ্রামের মানুষের কী ভূমিকা ছিল- সামাজিক সংগঠনগুলোর কী ভূমিকা ছিল-নাকি গ্রামের মানুষের উদ্যোগ তৈরি করেছে সামাজিক সংগঠনগুলো।

□□ গ্রামের মানুষের উদ্যোগ ছাড়াতো এটা হতে পারেনা। গ্রামের মানুষকে পরামর্শ দেওয়া, ভাবানো, তাকে পাশে থেকে একটু সাহায্য করা—এটা পঞ্চায়েতও করতে পারে, সামাজিক সংগঠনও করতে পারে, সমাজকর্মীরাও করতে পারে – আমরা যে কাজটি করেছিলাম,আমরা গ্রাম সংসদটাকে শক্তিশালী করার জন্য, গ্রামের সব পরিবারের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করেছিলাম। এই নিবিড় যোগাযোগ থাকার ফলে, আমরা সংসদ স্তরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করতে পেরেছিলাম মানুষের চাহিদা অনুযায়ী। সেই উন্নয়ন সমিতির সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। আর স্বনির্ভর দল যা ছিল, সঙ্গে নতুন দল তৈরি করতে পঞ্চায়েতকে সহযোগিতা করেছিলাম। স্বনির্ভর দলগুলিই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল এই কাজ করার জন্য। তাদের তাগিদটা সবচেয়ে বেশি ছিল। তারা যেহেতু গরিব পরিবার থেকে এসেছিল তারা চাইছিল কিছু আয়ের সুযোগ হলে,

সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে (উ. দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের জয়হাট গ্রাম) একটি বছর তারা প্রায় দু-কোটি টাকার মতো কাজ করতে পেরেছিল .... আর এই কাজের প্রায় অর্ধেক কাজ হয়েছে বনসৃজন ও পুকুর সংস্কারের

তারা যেভাবে পারবে সেটা করবে। সুতরাং নীচের দিকের মানুষের কিন্তু আগ্রহের সীমা নেই, কিন্তু মধ্যবর্তী স্তরগুলি সেটাকে ঠিক কাজে লাগাতে পারে না। যেখানে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সক্রিয়—শক্তিশালী সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পারে, সেখানে এটা হয়। তবে এই কাজটি করার জন্য যে অনুকূল পরিস্থিতি দরকার — আগেই বলেছি একটি রাজনৈতিক সংগঠন থাকা দরকার, একটি সামাজিক সংগঠন দরকার, একটি সংবেদনশীল পঞ্চায়েত দরকার, একটি খুবই নিঃস্বার্থ মানুষের জন্য কাজ করার মতো মানসিকতা সম্পন্ন, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি থাকা দরকার এবং মানুষকে জাগানোর একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া থাকা দরকার।

□ ...একেবরেই তাই। মানবদা আপনি পড়েছেন নিশ্চয়ই, EPW আগস্ট '০৮ প্রথম সপ্তাহে বেরিয়েছে যে জাগরুত দলিত আদিবাসী সংগঠন মধ্যপ্রদেশ, তারা বিশাল কাজ করেছে, নিশ্চয়ই অবাক হওয়ার মতো, এই সংগঠনের রেজিস্ট্রেশনও নেই, এই সংগঠন প্রায় ৮০ দিন থেকে তার গড়ে ১০০ দিন পর্যন্ত কাজের ব্যবস্থা করেছে। সেইখানে আমাদের খুব মনে হয় মানবদা, তাহলে আমরা মানে সামাজিক সংগঠন ডিআরসিএসসি, আপনারা এই লোককল্যাণ পরিষদ, এরকম অনেক সংগঠন আছে, আপনারা করছেন আমরা হয়তো একটু করেছি, তাহলে কি আরো বুঝে নেওয়ার দরকার...মানে কী করার দরকার ? যদি মধ্যপ্রদেশে এতবড় ঘটনা ঘটতে পারে...তাহলে কি আমাদের কোথাও অসুবিধে আছে...তাহলে কি আমাদের পঞ্চায়েত স্তরে গিয়ে একটু বসা দরকার।

□□ মূলত আমিতো আগেই বলেছি যে, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প যদি সফল করতে হয় তাহলে, শুধু পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর করলে চলবে না। কারণ পঞ্চায়েতেরও কতগুলো অসুবিধে আছে, তাদের কর্মীসংখ্যা কম। তাদের পরিকাঠামোর অভাব আছে। তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকে নিজেরা আবার খেটে খাওয়া পরিবার থেকে এসেছে। কোনো পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব নয় এই কাজটি একা সম্পূর্ণভাবে করা — অন্তত পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং সামজিক সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন, সমাজকর্মী সকলের সমবেত ও সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এটা করা সম্ভব নয়। এটা যেমন সামাজিক সংগঠনকে বুঝতে হবে যে এটা আমাদের পঞ্চায়েতের সঙ্গে কাজ করা দরকার আবার পঞ্চায়েতেরও বুঝতে হবে যে সামাজিক সংগঠন ছাড়া কাজটা আমি তুলতে পারব না। উভয়পক্ষের বোঝাপড়ার একটা ভালো দরকার আছে। এই

বোঝাপড়ার পরিবেশটা যেখানে ভালো হয়েছে, সেখানেই কাজটা ভালো হয়েছে। সেটা মধ্যপ্রদেশই হোক, রাজস্থানেই হোক আর পশ্চিমবঙ্গই হোক। পশ্চিমবঙ্গে যেখানেই কাজ ভালো হয়েছে সেখানেই এই বোঝাপড়া ভালো হয়েছে বলেই হয়েছে।...আমরা সামাজিক সংগঠনগুলো যে ধরনের কাজই করি না কেন, তা শিক্ষা-স্বাস্থ্য যাই হোক না কেন...আমি যদি তাকে ৫০ দিনের মজুরির ব্যবস্থা করে দিতে পারি, তাহলে তো আমার স্বাস্থ্যের কাজটার সহায়ক হবে-আমার শিক্ষার কাজেরও সহায়ক হবে। সেখানে আমাদের বোধ হয় অভিন্ন লক্ষ্য রেখে সামাজিক সংগঠন, গ্রামের সংগঠন, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি পঞ্চায়েত ইত্যাদির সমন্বিত উদ্যোগ দরকার, যাতে আমরা মধ্যপ্রদেশ বা রাজস্থানের মতো সফলতা অর্জন করতে পারি।

□ সেইখানে মানবদা ধরুন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যদি সংগঠন হিসেবে এটা জানতে চাই আপনার কাছে যে, আমাদের এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে আর কতদিন সুযোগ আছে...কতদিন কাজ করার সুযোগ আছে

□□ আপনারা যতই ভাবুন না কেন যে ২০১০-১১ সালের মধ্যে এটা শেষ হবে— আমার নিজের একেবারে ব্যক্তিগত ধারণা, এটা কোনো সরকারি বক্তব্য নয়...সেটা হচ্ছে যে, যদি আমরা পার্লামেন্টে লোকসভায় যারা কায়িক শ্রম করতে ইচ্ছুক তাদেরকে, যদি ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি দিয়ে থাকি, তাহলে সেই গ্যারান্টি পাঁচবছর পর তুলে নেওয়া যাবে না। সুতরাং আমাদের পাঁচবছর কেন, দীর্ঘদিন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, কারণ মৌলিক যে সমস্যাটা খেতমজুর ভূমিহীন শ্রমিকদের...এটা ছাড়া কোনো বিকল্প বর্তমানে নেই... আমরা ভাবতে পারি যে শিল্প বাড়লে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে...এটা কিন্তু সত্যি যে যদি শিল্পের বিকাশ সেভাবে ঘটে, তাহলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, সবদেশেই ঘটেছে...চাষবাস থেকে লোকে শিল্পে যাবে...কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ খেতমজুর একমাত্র চাষের উপর নির্ভর করে আছে, শিল্পকেও যদি ওই পরিমাণ অদক্ষ খেতমজুরকে কাজ দিতে হয়, সেই শিল্পকে কত বড় হতে হবে, তার আকার, আর আয়তন, তার পুঁজি, যে এতলোকের সংস্থান করতে পারবে, শিল্পের বিকাশ হোক কিন্তু, দুটো মিলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক একটা পরিবর্তন আনতে পারা যায়। যেমন ভূমিসংস্কারের সময় কৃষি ব্যবস্থার যে কিছু পরিবর্তন এসেছিল Structural কিছু পরিবর্তন ঘটছিল...আজকে আমাদের এখানে ৪ একরের বেশি জমি আছে এরকম সংখ্যাই কম। এই যে কাঠামোগত পরিবর্তন মাঝখানে হয়েছিল, এখন

পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ খেত-মজুর একমাত্র চাষের উপর নির্ভর করে আছে, শিল্পকেও যদি ওই পরিমাণ অদক্ষ খেতমজুরকে কাজ দিতে হয়, সেই শিল্পকে কত বড় হতে হবে

আর গর্ব করে বলতে পারিনা...যে একসময় আমাদের অত্যন্ত ভালো হচ্ছিল আমাদের গড় উৎপাদন সর্বভারতীয় স্তরে —– চাল বলুন...সবজি বলুন বা আমাদের ফলচাষ বলুন বা আলুচাষ বলুন, খুবই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। এটা হয়েছিল — এটা অনস্বীকার্য। সেটায় আমি দেখেছি যে চাষে সেই পরিমাণ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। চাষ যদি ভালো হয়, তাহলে সেখানেও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

□ তার মানে ভূমিহীন হয়ে যাওয়া-মানুষের শহরে চলে আসা-এসব বুঝিয়ে দেয় যে চাষ ভালো হচ্ছে না।

□□ চাষ ভালো হচ্ছে না, চাষ ভালো করতে পারলে সেখান থেকে যদি আমি কম বাইরে যাই, তাহলে শিল্পের উপরও কম চাপ পড়বে...অর্থাৎ যারা বাইরে যাবে তারা হয়তো লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে, তারা হয়তো বেশি দক্ষ...কিন্তু বাকি যাদের আমরা এখনো কারখানা শ্রমিক করার মতো যোগ্য করতে পারিনি, তাদের তো চাষ ছাড়া কোনো গতি নেই। সুতরাং সেই জায়গাটাতে আমাদের আরও বেশি কাজ করা নতুন ভাবনা নিয়ে কাজ করা, বিকল্প চাষের কথা ভাবা, শস্য বৈচিত্রের কথা ভাবা, সবসময় কিছু না কিছু করার কথা ভাবা, এগুলো না ভাবলে কর্মসংস্থান বাড়ানো যায় না ।

□ আচ্ছা আমার নিজের বাগান, নিজের চাষ, যে জমি প্রায় পতিত হয়ে আছে, সেগুলোকে রদবদল করার ক্ষেত্রে কি এখন থেকে কোনো সাহায্য আসতে পারে ?

□□ একটা কথা বলে রাখি যে ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট, মানে জাতীয় কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন ২০০৫ এটাতে কতগুলো মূল কাজের ধারা বলে দেওয়া আছে এবং কারা কারা এই কাজের সুযোগ পেতে পারে। সেটাও বলা আছে। যেমন আপনি যে প্রশ্নটা তুললেন, ব্যক্তিগত জমির উন্নয়নে...সেটাও সেখানে বলা আছে আবার আমাদের রাজ্যের প্রকল্পে যেটা আছে যে যদি বর্গাদার, পাট্টাদার বা ইন্দিরা আবাস যোজনা যিনি পেয়েছেন অর্থাৎ দরিদ্র পরিবার, যাদের নাম বিপিএল তালিকায় আছে, তাদের ব্যক্তিগত জমি বা তফশিলি জাতি বা আদিবাসী তাদের ব্যক্তিগত জমি, সেই জমির উন্নয়ন বা ব্যক্তিগত পুকুর তার উন্নয়ন তার জন্যও এই প্রকল্পে কাজ করা যায় সেক্ষেত্রে একটাই শুধু, যে গুচ্ছ প্রকল্প করলে ভালো হয় একসঙ্গে ১০-১২ জনের প্রকল্প নিয়ে করা হলে ভালো। একমাত্র বনসৃজন প্রকল্পে অর্থব্যয়ের কোনো সীমা নেই। কিন্তু এই প্রকল্পগুলি (বনসৃজন ছাড়া) ৫০,০০০ টাকার প্রকল্প হতে হবে। ছোট ছোট কাজ ধরুন...একটা কাজ ৫০০০ টাকার মধ্যে করা যায় বা

৫০০০ টাকার মধ্যে করতে হবে, তবে এরকম দশটি পরিবারকে এক জায়গায় নিয়ে, একটি গুচ্ছ প্রকল্প করে ব্যক্তিগত জমিতে, মানে ভূমি সংস্কারের যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন যেমন বর্গাদার-পাট্টাদার ইন্দিরা আবাস যোজনায় যাঁরা বা বিপিএল পরিবার তাঁদের ব্যক্তিগত জমি, ব্যক্তিগত জলা তার উন্নয়ন। ব্যক্তিগত বনসৃজন বা অন্য সম্পদ তৈরি ইত্যাদি শ্রমভিত্তিক কাজ করা যায়।

□ এখানে এই যে প্রচারের জায়গাটা মানবদা...এটা আমাদের মনে হয়েছে, আপনাদের মনে হয়েছে নিশ্চই নিরক্ষরতা তো এখনও বড় সমস্যা, এই প্রচারের ক্ষেত্রে লিখিত কিছু বা সাইনবোর্ড সবসময় মানুষ পড়ে বুঝতে পারছে এরকম নয়। তাহলে কি আমরা রেডিওকে ধরব, মাইকের মাধ্যমে প্রচার করব। একটা জিনিস মানবদা, কাজ করতে করতে বুঝতে পারছিলাম মানুষ জানে না, তাকে আগে জানাতে হবে তারপরতো তিনি সচেতন হবেন। এই জানানোর ক্ষেত্রে কী মাধ্যম হতে পারে।

□□ এই প্রকল্প চালু হওয়ার আগে থেকে ব্যাপক প্রচারের দরকার ছিল। এই ব্যাপক প্রচারটা সরকারের দায়িত্ব ছিল। সরকারি একটা প্রচার ব্যবস্থা আছে যদিও তা সর্বত্র পৌঁছাতে পারে না—কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প চালু হওয়ার পরে খবরের কাগজে, টিভিতে, রেডিওতে প্রচার করেছিল। রাজ্যস্তরেও প্রচার হয়েছে—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই প্রচার অন্তত খুব কম জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে।

□ এই পৌঁছালো না যে, তার কারণ মানে এই নয় যে সরকার প্রচার করেনি — তাহলে কি সেখানটায় আমি সংগঠন হিসেবে ঢুকতে পারি ?

□□ এই প্রচারের সীমাবদ্ধতার অনেকগুলো কারণ আছে। শুরুর আগে কেন্দ্রীয় সরকার একটা প্রচারের কাজ করেছে। প্রচারের কাজটা ঘোষণা-প্রধান না হয়ে, একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার।

□ এই কাজে সেচ বিভাগ বা বন বিভাগকেও তো যুক্ত করা যায়। কৃষি বিভাগকেও তো যুক্ত করা যায়।

□□ এনআরইজিএ-এর কাজ বনবিভাগ প.মেদিনীপুরে করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বিভাগকে নিয়ে কাজ করার সফল নজির নেই। বিভাগে বিভাগে ভাগ। এটা যে বিভাগ না, স্থানীয় সরকার সেটা বুঝতে হবে। পঞ্চায়েত যদি স্থায়ী সমিতি বা উপসমিতির মাধ্যমে বিভাগগুলোকে বলে যে, আপনারা আমাদের কাজে সাহায্য করুন, তাহলে আশা করি অনেক জায়গায় সাড়া দেবে।

□ যদি এবার যে মজুর কাজ পাবে তার জায়গা থেকে বলি মানবদা যে, প্রথমত তিনি যদি বুঝতে পারেন আমি এভাবে কাজ পেতে পারি, সেক্ষেত্রে

পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বিভাগকে নিয়ে কাজ করার সফল নজির নেই। বিভাগে বিভাগে ভাগ। এটা যে বিভাগ না, স্থানীয় সরকার সেটা বুঝতে হবে

তো তার প্রথম কাজ একটা আবেদন করা। দ্বিতীয় কাজ, জব কার্ড পাওয়া। তৃতীয় কাজ কাজের আবেদন করা। এরপর কাজটা গ্রাম পঞ্চায়েত বরাদ্দ করে দেবে।...এই পুরো কাজটায়, আমি যদি পড়াশোনা না জানি তাহলে আমার আবেদনপত্র পূরণ করা সম্ভব হবে না।

□□ এটা আইনে বলা আছে, রাজ্য প্রকল্পে বলা আছে, সরকারি আদেশনামায় বলা আছে যে, কেউ আবেদনপত্র পুরণ না করতে পারলে পঞ্চায়েত তাকে সহায়তা দেবে...

□ সেখানে কি কোনো নির্দিষ্ট কর্মী আছে?

□□ কোনো নির্দিষ্ট কর্মী নেই, তাই সহায়তাও পাওয়া যায় না। আর দ্বিতীয়ত একথাও বলা আছে যে, একসঙ্গে যদি জব কার্ড আছে এরকম দশজন আবেদন করেন, তাহলে তারাও একসঙ্গে একত্রে আবেদন করতে পারেন।...কিন্তু সেটাও অনেক সময় গ্রহণ করা হয় না। ৪ক আবেদনপত্র অনেকেই পূরণ করতে, পারবে না। ৪ক পূরণ করতে একটা সামাজিক সহায়তা দরকার।...মানে আমাদের মতো সংগঠনের সহায়তা দরকার।...আবার পঞ্চায়েত–এরও মানসিকতা থাকা দরকার।

যে আমি আবেদনপত্র গ্রহণ করব। তার মানে যদি বলা হয় আমার টাকা নেই, বরাদ্দ নেই, আমার এখন ফর্ম নেই, সুতরাং আমি কাজ দিতে পারব না, তাহলে আবার সবাই নিরুৎসাহিত হবে।

□ আচ্ছা মানবদা, যদি বলি যে আমি কাজের আবেদন করলাম, কাজ না পেলে আমি নালিশ জানাতে পারি নোডাল অফিসার বিডিও-র কাছে, কিংবা ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর-এর কাছে। এরকম নালিশের উদাহরণ কটা হল, যেখানে মানুষ নালিশ করতে উৎসাহিত হবে।

□□ ব্যবস্থা অনেক আছে। যেমন ধরুন, প্রথমত এনআরইজিএ নিয়ে কোনো নাগরিকের যদি অভিযোগ থাকে, তার জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা করে অভিযোগ বাক্স থাকার কথা।

□ কোনো সময়সীমা আছে?

□□ কোনো সময়সীমা নেই। কাজের আবেদনের ১৫ দিন পর থেকে অভিযোগ জানানো যায়। প্রথমে বিডিও-র কাছে আবেদন করতে পারে, তার ১৫ দিন পর কোঅর্ডিনেটর-ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। কিন্তু উদাহরণ খুব কম।

□ জেলার নামটা

□□ এভাবে এখনই মনে করে বলতে পারবনা। কারণ উদাহরণগুলো খুব বেশি নেই। তবে কাজের ক্ষেত্রে দু-একটা জায়গায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খুব উৎসাহ দেখিয়েছেন। এখানে আমি বলতে পারি উ. ২৪ পরগনার যে ডি

এম আছেন, তার উৎসাহেই কাজটা ওই জেলায় বেশ ভালো হয়েছে। শেষে হলেও ভালো হয়েছে। এখানে সংখ্যায় বেশি হয়েছে বলব না, তবে যেটুকু হয়েছে তার নেতৃত্বেই হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় রাজনৈতিক দল বা সংগঠন, তাদের সংগঠিত করে আন্দোলন করে কিছু সুফল পেয়েছে এরকম উদাহরণও আছে। কিন্তু এই উদাহরণগুলো খুব কম এবং আমি বিশ্বাস করি সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী, পঞ্চায়েত কর্মী ও সরকারি কর্মী সকলেই যদি সংবেদনশীল না হই, খেতমজুরের সমস্যাটা যদি আমাদের মনে গেঁথে না যায়...এটায় তার একটা বড় সহায়তা করতে পারি সেই মানসিকতা তৈরি না হলে, শুধু অভিযোগ করে বা লোক দেখিয়ে যে একটা পরিবর্তন, তা হবে না। সুতরাং লাগাতার প্রচার—লাগাতার মানুষকে তৈরি করা এই প্রক্রিয়া না হলে যে লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছানোর কথা, সেখানে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মনে করি এইজন্য দরকার দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক ইচ্ছা, একটি শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন, শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন এবং একটি সংবেদনশীল কর্মীবাহিনী। যারা দরদ দিয়ে কাজটা বুঝবে। মানে কোনোরকম ডিউটি করা নয়। সেইজন্যই আমি বলি, এনআরইজিএ প্রকল্প আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সুযোগ। এই সুযোগটা পঞ্চায়েত যদি ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে জনগণের সঙ্গে পঞ্চায়েতের যে বন্ধন সেটাও শক্তিশালী হবে এবং আস্তে আস্তে কিন্তু পঞ্চায়েত জনগণের কাছে পৌঁছাবে, জনগণ পঞ্চায়েতকে নিজের সরকার বলে মনে করবে এবং তখনই কিন্তু এটা জনগণের সরকার, স্থানীয় সরকার বা স্বশাসিত সরকার হবে। সুতরাং প্রতিটি পঞ্চায়েতকে এই প্রকল্প একটি চ্যালেঞ্জ ও অপরচুনিটি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আমার সদিচ্ছা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে রইল, যদি তারা এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে কয়েকটি সফল নজির তৈরি করে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ আবার একটা নতুন পথ দেখতে পারে।

□ মানবদা আর একটা প্রশ্ন, এখনে মানুষ টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে।

□□ সমস্ত মজুরি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেওয়া চলছে।

□ আর একটা প্রশ্ন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর যখন এই প্রকল্পটা তৈরি করল, তার পর পঞ্চায়েত প্রধান, সচিব বা কর্মীদের নিয়ে কোনো Orientation বা ধারণা শিবির হয়েছিল কি ?

□□ এই প্রকল্পের মধ্যেই কর্মীদের সামর্থ বাড়ানোর জন্য একেবারে অর্থ বরাদ্দ আছে। এই কাজটি সরকারিভাবে করা

পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বিভাগকে নিয়ে কাজ করার সফল নজির নেই। বিভাগে বিভাগে ভাগ। এটা যে বিভাগ না, স্থানীয় সরকার সেটা বুঝতে হবে

হয়েছে এবং এই সপ্তম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পর, পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে তাদের একটি সরকারি প্রশিক্ষণ হয়েছে। সরকারি প্রশিক্ষণে অনেকগুলো বিষয় থাকে। কিন্তু আলাদা করে এই বিষয়ে যতটা প্রশিক্ষণ হওয়া দরকার ততটা হয়নি। কিন্তু সেই ব্যবস্থা করা কিন্তু যায়। সেই সুযোগও আছে—শুধু তাই নয় আমার তো মনে হয় যারা একটু আগ্রহী, তাদেরকে তো রাজস্থানে নিয়ে দেখানোই যেতে পারে যে তাঁরা কেমন করে করতে পারলেন।

□ গ্রামের মানুষের Orientation-এ পঞ্চায়েত কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে

□□ গ্রামের মানুষকে বোঝাতে প্রচার ছাড়া কিছু নেই। সেই কাজটার দায়িত্ব নিতে হবে সামাজিক সংগঠনকে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ভূমিকা আছে। তাদেরই তদারকি করার কথা। অডিট করার কথা...

মানবদা এই ব্যস্ততার মধ্যে অনেকটা সময় আমাদের দিলেন। অনেক নতুন দিশা পেলাম আমরা। ডিআরসিএসসি'র পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। □

কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ও পুরুলিয়া

রাজকৃষ্ণ মুখার্জি

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ''সারা পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ৪৬১২টি গ্রামের ৯৯৪টি রয়েছে পুরুলিয়া জেলায়''। পুরুলিয়ায় গ্রামের সংখ্যা ২৪৬৮। অর্থাৎ ৪০.২৭% গ্রামই অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া।

জনসমষ্টির পরিচয় একনজরে

- গ্রামীণ জনসংখ্যা ৮৯.৯৩% (পশ্চিমবঙ্গ : ৭২.০৩%)।
- ৪৩.৬৫% পরিবার বিপিএল (পশ্চিমবঙ্গ : ৩৬.৩৮%)
- আয় সূচক ০.১৮ (পশ্চিমবঙ্গ : ০.৪৩)
- তফশিলি জনসংখ্যা ১৮.২৯% (পশ্চিমবঙ্গ : ২৩.০২%)
- স্কুলছুট ৩৭.৯৫% (পশ্চিমবঙ্গ : ২৯.৭০%)
- মানব উন্নয়ন সূচক ০.৪৫% (পশ্চিমবঙ্গ : ০.৬১%)
- ১৮.২২% বাড়িতে বিদ্যুত আছে (পশ্চিমবঙ্গ : ২৪.৩৪%)
- মহিলা সাক্ষরতা (তফশিলি জাতি) ২৬.৩৫% (পশ্চিমবঙ্গ : ৪৬.১০%)
- মহিলা সাক্ষরতা (তফশিলি উপজাতি) ২৩.৪০% (পশ্চিমবঙ্গ : ২৯.১৫%)

এরকম একটি পশ্চাদপদ জেলায় এই প্রকল্পের রূপায়ণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৫ সালে এই আইন প্রণয়ন শুধু কাজের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি বরং বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা, গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টি এবং দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

বামপন্থীরা দাবি করেন যে এই আইন প্রণয়নে তাঁদের অবদান অনেকখানি। স্বভাবতই বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গে এই আইনের রূপায়ণ প্রাধান্য পাবে তাই অভিপ্রেত। আরও স্বাভাবিক এই যে, এই রূপায়ণে পুরুলিয়ার মতো একটি প্রান্তিক জেলায় বামপন্থীদের নজর পড়বে।

পর্যালোচনার ক্ষেত্রে পুরুলিয়াকে বাছার কারণও উপরিউক্ত কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বলে রাখা ভালো যে পর্যালোচনার পরিসর স্বল্প। চারটি গ্রাম, চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং দুটি ব্লকের সমীক্ষা নিশ্চিতভাবেই সামগ্রিক পুরুলিয়ার চিত্র তুলে ধরবে না।

কিন্তু এই সমীক্ষা থেকে সাধারণ সমস্যাবলি রূপায়ণে বিশেষ কিছু সমস্যার দিক বেরিয়ে আসবে আশা রাখি।

নীচে একটা নকশা এঁকে বিষয়টা বোঝানো হল :

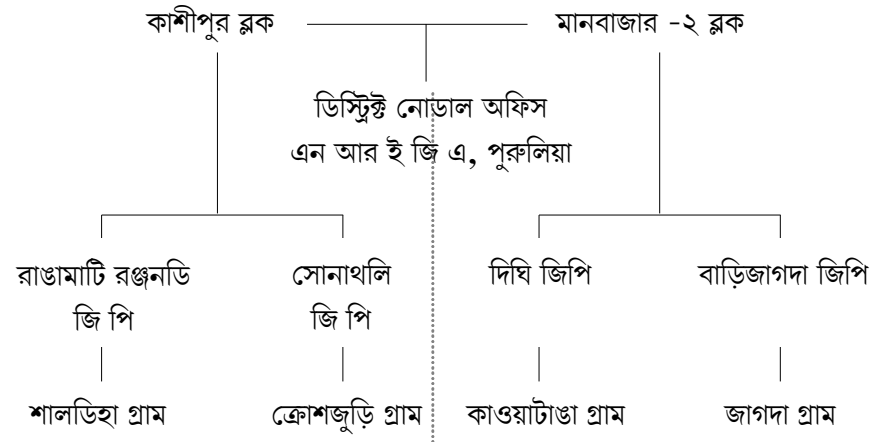

পর্যালোচনার পদ্ধতি :

পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমরা চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

১. নির্দিষ্ট গ্রামগুলোয় একটি করে গ্রুপ ডিসকাশন যাতে গ্রামের নারী-পুরুষ এবং গ্রাম সংসদ-সভ্যরা থাকবেন।

২. গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান, সেক্রেটারি এবং এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলোচনা।

৩. ব্লকস্তরে বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলোচনা।

৪. জেলাস্তরে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার (এন আর ই জি এ) এবং তাঁর সহকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলোচনা।

পর্যালোচনার লক্ষ্য মূলত প্রকল্প রূপায়ণে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলার পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রস্তুতির অবস্থাটি খতিয়ে দেখা এবং যে যে ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকছে তার প্রতি দিক নির্দেশ করা। এছাড়াও উপরতলায় যে ধরনের সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে তার রূপায়ণের বাস্তব চিত্রটি কী সে সম্বন্ধে আলোকপাত করা।

সরকারি কার্যনির্বাহের নাগরিক পর্যালোচনা সরকারের কাছে কতটা অভিপ্রেত, তা ব্যতিরেকেই নাগরিক উদ্যোগ চালু থাকে। বর্তমান পর্যালোচনা সেরকমই একটি উদ্যোগ।

জীবিকার সুরক্ষাকে আরও বেশি সুনিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন ২০০৫-এর সৃষ্টি। জীবিকার অধিকার ভারতের সংবিধানে বিধিবদ্ধ একটি মৌলিক অধিকার। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের *দুটি সনদেরই স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সরকার অন্যান্য অধিকার সমেত কাজের অধিকারকেও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য (যদিও মনে রাখা দরকার যে এই দুটি সনদের Optional Protocol-এর একটিতেও ভারত স্বাক্ষর করেনি)। সংবিধানবদ্ধ বহু মৌলিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মূল ধারণাগুলি আমাদের দেশে আদৌ বাস্তবায়িত না হলেও গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের মাধ্যমে কাজের অধিকারের স্বীকৃতি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

দারিদ্র মূলত একটি গ্রামীণ প্রক্রিয়া — সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের মতো ভারতেও এটি সত্য। এছাড়াও ভারতে কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার নিরাশাজনকভাবে কমে যাওয়ার অবস্থান থেকে, এই আইন ও তার রূপায়ণ অসম্ভব গুরুত্বের দাবি রাখে। বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপদান, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুর্নবিন্যাস ও সুদৃঢ়করণের হাতিয়ার হিসেবেও আমরা গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পকে ব্যবহার করতে পারি। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকেও এই আইন ও তার বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু রূপায়ণের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার এবং প্রশাসনিক মানসিকতার পরিবর্তন। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পেরও নিরাশাজনক পরিসমাপ্তি ঘটেছে। গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পকে যদি সত্যিই রূপায়িত করতে হয়, তাহলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং ইতিবাচক প্রশাসনিক মনোভাবযুক্ত একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রথমেই তৈরি করা দরকার।

পর্যালোচনা :

ক। গ্রাম : শালডিহা, গ্রাম পঞ্চায়েত : রাঙামাটি-রঞ্জনডি, তারিখ : ৩০.১১.২০০৭

এই আলোচনায় প্রায় ৩৫-৪০ জন উপস্থিত ছিলেন, সকলেই তফশিলি উপজাতি। যে সমস্ত তথ্য বেরিয়ে আসে :

১. সবাই জানেন এরকম একটি প্রকল্প চালু হয়েছে।
২. প্রকল্পে কাজের জন্য যে দাবি করতে হয় তা কেউই জানেন না।
৩. এই প্রকল্পে তফশিলি উপজাতির জন্য কী কী বিশেষ সুবিধা আছে তাঁরা জানেন না।
৪. কিছু মানুষের ধারণা রয়েছে যে, যে দল সরকার পরিচালনা করে সেই দলভুক্ত লোকেরাই কাজ পাবে।

* 1. International Covenant on Civil and Political Rights,
2. International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights.

৫. গ্রাম সংসদে গৃহীত কাজের পরিকল্পনা যে উপর থেকে বন্ধ করে দেওয়া যায় না, সেই বিষয়েও কোনও ধারণা তাঁদের নেই।
৬. সভায় মহিলাদের উপস্থিতি থাকলেও, তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছিলেন না। এই প্রকল্পের আওতায় যে মহিলাদের প্রাধান্য দিতে হবে, তা শুনে অংশগ্রহণকারী মহিলারা বিস্মিত হয়েছেন।
৭. যাঁরা জব কার্ডের জন্য আবেদন করেছিলেন তাঁরা সকলেই জব কার্ড পেয়েছেন, যদিও জব কার্ডে ছবি নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রণীত এই প্রকল্প সম্বন্ধীয় নিয়মাবলি থেকে, এই প্রকল্পে কী ধরনের কাজ করা যায় এবং তফশিলি উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের কী কী সুবিধা আছে তা জানানো হয়। অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করা হয় যে ''কাজের দাবি করতে হয়'' এই বিষয়টি যে যে জানতে পারলেন, তাঁরা যেন অন্যদের মধ্যে তা প্রচার করেন।

সিদ্ধান্ত

১. এই প্রকল্পে, বিশেষত তফশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষদের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুবিধা আছে যে সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার।
২. ''কাজের দাবি করতে হবে''— এ কথার ব্যাপক প্রচার।
৩. বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা তৈরিতে গ্রাম সংসদের যত্নবান ও সচেষ্ট হওয়া
৪. মহিলাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ. গ্রাম পঞ্চায়েত : রাঙামাটি-রঞ্জনডি, ব্লক : কাশীপুর, তারিখ : ৩০.১১.২০০৭

২৬ নভেম্বর, ২০০৭ এন আর ই জি এ ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, কাশীপুর ব্লকের রাঙামাটি-রঞ্জনডি পঞ্চায়েতে ২০৪১টি পরিবারের ৫৫৫৮ জন মানুষের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, কিন্তু কেউ কোনও জব কার্ড পাননি এবং কেউ কোনও কাজও পাননি ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে এন আর ই জি এ সংক্রান্ত যে সমস্ত স্যাংশন অর্ডার নভেম্বর মাস পর্যন্ত রয়েছে, তার একটিতেও পুরুলিয়া জেলার জন্য ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের বরাদ্দের উল্লেখ ছিল না। যদিও অন্য সমস্ত জেলা এবং এমনকি শিলিগুড়ি মহকুমা পর্ষদের জন্যও অর্থ তখনই বরাদ্দ হয়েছিল।

বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আমরা এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। রাঙামাটি-রঞ্জনডি গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা দেখা করি সেক্রেটারি পূর্ণচন্দ্র মাহাতোর সঙ্গে। আলোচনায় যে সব তথ্য বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ :

১. প্রত্যেক মাসেই এন আর ই জি এ সংক্রান্ত জব কার্ড ইস্যু এবং খরচের হিসেব পাঠানো হয় কাশীপুর ব্লক অফিসে। নভেম্বর মাস পর্যন্ত হিসেব পাঠানো হয়েছে। (২৭.১১.২০০৭-এর একটি কম্পিউটার প্রিন্ট তিনি আমাদের দেন)।
২. সেই চিত্র অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ২৪৫৭টি পরিবারের মধ্যে ২০৯৮টি পরিবার রেজিস্ট্রিকৃত এবং

২১০১ জনকে জব কার্ড ইস্যু করা হয়েছে (এই হিসেবে কিছু ভুল রয়েছে যদিও তা এমন কিছু নয়)

৩. ২৭.১১.২০০৭ তারিখের রাঙামাটি-রঞ্জনডি পঞ্চায়েতের রিপোর্ট ব্লকে পাঠানো পর্যন্ত যে ব্যয় হয়েছে, তা ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের তহবিল থেকে। এই রিপোর্ট পাঠানোর পর নভেম্বর মাসেই ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের ফান্ড হিসেবে এই গ্রাম পঞ্চায়েত ২ লক্ষ টাকা পায়।

৪. পঞ্চায়েত অফিসে প্রিন্টার সহ একটি কম্পিউটার রয়েছে। যদিও ইন্টারনেট নেই। একজন কর্মী রয়েছেন যিনি কম্পিউটার চালাতে জানেন।

৫. পঞ্চায়েত কর্মীরা এনআরইজিএ নিয়ে ট্রেনিং জেলা পরিষদ থেকে পেয়েছেন।

৬. এনআরইজিএ ঘিরে ২০০৭-০৮ সালের কাজের পরিকল্পনা ব্লক এবং জেলাস্তরে গৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনায় যে সমস্ত ফাঁক ছিল তা ঠিক করতে ব্লক আধিকারিকরা সাহায্য করেছেন।

৭. নিজেদের এলাকার বাইরে কাজ বরাদ্দ করা বিষয়ে মানুষের সংশয় রয়েছে।

৮. ভাদ্র-আশ্বিন মাসে যখন লোকের কোনো কাজ ছিল না তখন পঞ্চায়েতের তহবিলে কোনো অর্থ ছিল না।

৯. পঞ্চায়েত মনে করে যে লোকেরা বেশি বেশি সংখ্যায় কাজ দাবি করলে এই প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত হবে। এনজিওরা এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারে বলেও পঞ্চায়েত মনে করে।

সিদ্ধান্ত

১. পঞ্চায়েত স্তরেও ব্যয় সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্টে ভুল থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, এই ব্যাপারে সবিশেষ যত্ন নেওয়া।

২. বছরের কোন্ সময়ে মানুষের কাজের প্রয়োজনীয়তা বেশি তা নির্ধারণ করা এবং সেই সময়ে পঞ্চায়েত তহবিলের অর্থ সুনিশ্চিত করা।

৩. ২০০৭-০৮ সালের বাকি সময়টুকুর মধ্যে, চলতি আর্থিক বছরের কাজের পরিকল্পনা রূপায়িত করার কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করা। কন্টিনজেন্সি (আপৎকালীন) তহবিল যে ২% থেকে বাড়িয়ে ৪% করা হয়েছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে তার সফল ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া।

৪. এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছাড়াও ঠিকার ভিত্তিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করার কথা বিবেচনা করা (এক্ষেত্রেও কন্টিনজেন্সি তহবিল ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা)

৫. সম্পদ রেজিস্টারের কোনো উল্লেখ নেই। এ বিষয়েও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া।

৬. কম্পিউটার অপারেটর এবং ইন্টারনেট পরিষেবা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সুনিশ্চিত করা।

৭. ক. প্রচারাভিযানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে স্থানীয় বা ব্লক স্তরের এনজিও-র সাহায্য একান্তভাবেই প্রয়োজন (বর্তমান পরিকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে)।

খ. প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতি (দেওয়াল লিপি, লিফলেট, পোস্টার, ফ্লেক্স) ব্যবহার যাতে গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা

প্রকল্পের মূল বিষয়গুলো যেমন— কাজের দাবি, গ্রাম সংসদের পরিকল্পনা, সম্পদ সৃষ্টি, ব্যবহার এবং তফশিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত মানুষদের বিশেষ সুযোগ সম্বন্ধে মানুষ সম্যক অবহিত হয়।

গ. এই প্রকল্পে কাজ পাওয়া একটি নাগরিক অধিকার। দলীয় সমর্থনের উপর যা নির্ভর করে না — প্রচারে এ দিকটিও তুলে ধরা।

ঘ. গ্রাম পঞ্চায়েত : ক্রোশজুড়ি, সোনাথলী, তারিখ : ০১.১২.২০০৭

আলোচনায় ১০-১২ জন জড়ো হয়েছিলেন। সকলেই মহিলা এবং তফশিলি উপজাতিভুক্ত। আলোচনার মাধ্যমে যে তথ্য বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ :

১. প্রকল্পের কথা জানলে ও তাতে কাজ করলেও, কাজের জন্য যে দাবি বা আবেদন করতে হয় তা জানেন না।

২. এই প্রকল্পে কী কী ধরনের কাজ করা যায় এবং তফশিলি উপজাতিভুক্তের ক্ষেত্রে কী বিশেষ সুবিধা রয়েছে তা জানেন না।

৩. অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া কেউ খুব একটা সরব ছিলেন না।

ঙ. গ্রাম পঞ্চায়েত : সোনাথলী, ব্লক কাশীপুর, তারিখ : ০১.১২.০৭

ছুটির দিন হওয়ায় এই পঞ্চায়েতে কাউকে পাওয়া সম্ভব হয় নি।

চ. ব্লক : কাশীপুর, তারিখ : ১০.১২.২০০৭

বিডিও শ্রীমতী সুদেষ্ণা মিত্রের সঙ্গে কথা হয়। যে সমস্ত তথ্য জানার ছিল তা হল

১. প্রকল্পের আওতায় পাঁচ বছরের Perspective পরিকল্পনা এবং ২০০৭-০৮ এর কার্য পরিকল্পনা।

২. ২০০৭-০৮ সালের কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় NREGS-এর ব্লক স্তরের পরিকাঠামো।

৩. ইউ এন ডি পি এবং ভারত সরকারের যৌথ সহযোগিতায় Strengthening State Plans for Human Development (SSPHD)-এর উদ্যোগের আওতায় রাজ্যের পরিসংখ্যানগত ব্যবস্থাকে (State Statistical System) জোরদার করার কাজ এই ব্লকেও শুরু হয়েছে কি না?

৪. ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কম্পিউটারাইজেশনের অবস্থা (NREGA-এর প্রেক্ষিতে)

৫. ব্লকস্তরে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের অবস্থা।

বিডিও ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার-এর অনুমতি সাপেক্ষে তথ্য দেবেন বলে জানান। একই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জয়েন্ট বিডিও'র মতামত একটু ভিন্নরকম। তিনি বর্তমান বছরে NREGS-এর কার্য পরিকল্পনার জেরক্স কপি দিতে স্বীকার করেন, যদিও বর্তমান প্রতিবেদন তৈরি হওয়া পর্যন্ত তা পাওয়া যায়নি।

জয়েন্ট বিডিও আরও বলেন যে, দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে সরকারি প্রকল্পের রূপায়ণ অনেক ভালোভাবে হচ্ছে, কারণ সেখানে ব্লকস্তরে দুজন করে বিডিও রয়েছেন এবং ব্লকস্তরে কর্মী সংখ্যাও অনেক বেশি। পক্ষান্তরে, পশ্চিমবঙ্গে ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে

কর্মী অপ্রতুলতার উপর জোর দেন। কাশীপুর ব্লককে তিনি একটি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন ব্লক হিসেবে অভিহিত করে বলেন যে, সমস্ত সরকারি প্রকল্প অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এখানে রূপায়িত হয়।

সিদ্ধান্ত

১. আমলাতান্ত্রিকতার ঘেরাটোপ অব্যাহত।

২. প্রকল্পের যে বিষয়গুলো আমরা জানতে চেয়েছিলাম, তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ অনুযায়ী তা স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা (Proactive Disclosure)-এর আওতায় পড়ে এবং তা জানার অধিকার সমস্ত নাগরিকের রয়েছে। আইনত জয়েন্ট বিডিও একজন জনতথ্য-অফিসার এবং বিডিও একজন Public Authority — কাজেই তথ্যের অধিকার আইন সম্বন্ধে প্রশাসনে যে সম্যক ধারণা এবং ইতিবাচক মানসিকতার অভাব রয়েছে তা দৃশ্যমান।

৩. ব্লকস্তরে কম্পিউটার পরিকাঠামোর (NREGA সংক্রান্ত) অভাব বিদ্যমান। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কোনও তথ্যই এখানে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়নি)।

৪. ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে এনজিওকে কাজে লাগানোর কোনো পরিকল্পনা নেই, বিপরীতপক্ষে এই সংগঠনগুলো কোনো উদ্যোগ নিলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে এই আর্থিক বছরের প্রথমেই নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে।

ছ. গ্রাম : জগদা, গ্রাম পঞ্চায়েত : বাড়িজগদা, ব্লক : মানবাজার ২, তারিখ : ১০.১২.২০০৭

আলোচনায় প্রায় ১৫ জনের মতো উপস্থিত ছিলেন। যে তথ্যগুলো বেরিয়ে এল

১. এখানেও মানুষ জানেন না যে, এই প্রকল্পের কাজ পেতে হলে কাজের জন্য লিখিত দাবি জানাতে হবে।

২. কী ধরনের কাজ এই প্রকল্পে করা যায় তাও জানেন না।

৩. কাজের দাবি না করেও লোকে এখানে কাজ পেয়েছেন।

জ. গ্রাম পঞ্চায়েত : বাড়িজগদা, ব্লক : মানবাজার ২ তারিখ : ১১.১২.২০০৭

পঞ্চায়েতটি কংগ্রেস পরিচালিত আলোচনায় নীচের তথ্যগুলো আসে :

১. পঞ্চায়েতের ২২০০ পরিবারের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২০০০ (আনুমানিক) জব কার্ড হয়েছে।

২. যাঁরা জব কার্ড পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকই কাজের জন্য আবেদন করেছেন।

৩. গ্রাম সংসদের যে সব পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লকে পাঠিয়েছিল, তার অনেককিছুই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ অজানা।

৪. কম মজুরি পাওয়া সত্ত্বেও এই পঞ্চায়েতের অনেক বাসিন্দাই বর্ধমান বা অন্যত্র চলে যাচ্ছে কারণ সেখানে একসঙ্গে টাকা পাচ্ছে।

৫. পঞ্চায়েতের কোনো ওভারসিয়ার নেই।

৬. NREGS-এর Contingency-র (আপৎকালীন তহবিল) টাকা ২% থেকে বাড়িয়ে ৪% যে করা হয়েছে তা এঁদের জানা নেই।

৭. বেশি যন্ত্রপাতি লাগছে বলে রাস্তার কাজ করা যাচ্ছে না।
৮. ৪ (ক) ফর্ম ঠিকমতো পূরণ করা হচ্ছে না।
৯. এই প্রকল্প সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন এনজিও যদি সাহায্য করে, তাহলে পঞ্চায়েত সেই সাহায্য নিতে রাজি।

সিদ্ধান্ত

১. সাধারণভাবে NREGS নিয়ে গণসচেতনতা প্রসারের বন্দোবস্ত করা। নির্দিষ্টভাবে কাজের দাবি ও নির্দিষ্ট ফর্মগুলো পূরণ করা নিয়ে মানুষকে অবহিত করা।
২. গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণের অধিকার — বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার এই মূল সুরটি যাতে বিঘ্নিত না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা।
৩. জীবিকার খোঁজে দূরে যাওয়া (মাইগ্রেশন) রোখার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট প্রচার — NREGS -এর একটি মূল লক্ষ্য এই মাইগ্রেশন রোখা।
৪. কন্টিনজেন্সির বর্ধিত টাকা ঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে বর্ধিত কর্মী নিয়োগ করে এই প্রকল্পকে সাফল্যমণ্ডিত করা।
৫. বেশি যন্ত্রপাতি লাগার জন্য বা বেশি উপাদান—উপকরণ লাগার জন্য রাস্তার কাজ না করতে পারার অসুবিধের নির্দিষ্ট সমাধান।

ঝ. গ্রাম : কাওয়াটাঙা, গ্রাম পঞ্চায়েত : দিঘি, ব্লক : মানবাজার ২, তারিখ : ১১.১২.২০০৭

প্রায় ২২ জন উপস্থিত ছিলেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উঠে আসে :

১. কাজের দাবি অনেকেই করেননি।
২. এই প্রকল্পে অনেকেই কাজ পেয়েছেন কিন্তু পুরো ১০০ দিনের কাজ একটি পরিবারও পাননি।
৩. জল সংরক্ষণ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। সেই কারণে তফশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষদের জমিতে হাঁপা ডোবা তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রাম সংসদে গৃহীত হয়েছিল।

সিদ্ধান্ত

১. সাধারণভাবে NREGS সম্বন্ধে সচেতনতা এবং কাজের দাবি করার বিষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা।
২. প্রত্যেকটি পরিবার যাতে ১০০ দিনের পুরো কাজ পায়, সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বর্ধিত কন্টিনজেন্সির টাকায় তার পরিপূর্ণ রূপায়ণকে সম্ভব করে তোলার বাস্তবমুখী উপায় ঠিক করা।
৩. এই প্রকল্পের মাধ্যমে তফশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষদের জমিতে হাঁপা ডোবা তৈরি করে, কাজের অধিকার ও খাদ্যের অধিকারকে সুনিশ্চিত করা

ঞ . গ্রাম পঞ্চায়েত : দিঘি, ব্লক : মানবাজার ২, তারিখ : ১১.১২.২০০৭

পঞ্চায়েতের সচিব এবং এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে আলোচনাক্রমে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো সামনে আসে :

১. এই পঞ্চায়েতে ইস্যুকৃত ২৪৫০টি জব কার্ডের মধ্যে মোটে ৩০০ জনের মতো মানুষ কাজের জন্য দাবি করেছেন।

২. ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৩. কাওয়াটাঙা গ্রাম সংসদের হাঁপা ডোবার পরিকল্পনা রদের বিষয়ে পঞ্চায়েতের বক্তব্য পরিষ্কার নয়। তাঁদের বক্তব্য হল, অন্য সব পরিকল্পনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ওগুলো বাদ পড়তে পারে। যদিও বিষয়টি তাঁরা আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করবেন এবং পরের বছর এটিকে পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করবেন বলে আশ্বাস দেন।

৪. এখানে একটি নির্দিষ্ট সমস্যা দেখা দিয়েছে। বর্ষার সময় রাস্তার কাজ করতে গিয়ে বেশি পরিমাণে মোরাম ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফলে কাজের ক্ষেত্রে শ্রম এবং উপাদান-উপকরণ অনুপাত কমে যাওয়ায় কাজ করতে বাস্তবিক অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।

৫. এই পঞ্চায়েত এলাকায় আমরা বেশ কয়েকটি দেওয়াল লিপি দেখেছি যা অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখিনি।

৬. পঞ্চায়েত আধিকারিকদের মতে, গ্রাম সংসদের বার্ষিক দুটো সভার সময় পরিবর্তন অন্তত পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে করা দরকার। মে মাসে প্রচণ্ড গরম এবং ডিসেম্বর মাসে অসম্ভব শীতের দরুন সভাগুলোয় যথেষ্ট জনসমাগম না হওয়ায় পরিকল্পনায় গলদ থাকার সম্ভাবনা।

৭. ডিসেম্বর, ২০০৭-এর একেবারে শেষে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের প্রথম কিস্তি এসে পৌঁছেছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে ২.৬৪ কোটি টাকার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব কি না সেই সম্বন্ধে পঞ্চায়েত নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারেনি।

ট. ডিস্ট্রিক্ট এনআরআইজিএ সেল, তারিখ : ১০.১২.২০০৭

নোডাল অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট এনআরআইজিএ সেল শ্রী শঙ্করপ্রসাদ পাল, জয়েন্ট নোডাল অফিসার শ্রী তপনকুমার ঘোষ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনায় যে সব তথ্য বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ :

১. ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত (MORD-র ওয়েবসাইট অনুযায়ী) পুরুলিয়ায় এই প্রকল্পে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের কোনও কেন্দ্রীয় সাহায্য না আসার কারণ, ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না দিতে পারা।

২. সমস্ত ব্লকের জন্য এই প্রকল্পের আওতায় ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া সমাপ্তির পথে। খুব তাড়াতাড়ি এরা কাজে যোগদান করবেন।

৩. উপরিউক্ত কারণে NREGA ওয়েবসাইটে পুরুলিয়ার যে হিসাব ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পাওয়া গেছে (MIS reports) তা ঠিক অবস্থার দিকনির্দেশ করে না।

৪. পঞ্চায়েতের বর্তমান কর্মী পরিকাঠামো এই প্রকল্প সংগঠিত করার জন্য কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়।

৫. বিশেষত NREGA সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচি এত কম পঞ্চায়েত কর্মীর দ্বারা সম্ভব নয়।

৬. কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাবে

পঞ্চবার্ষিকী Perspective পরিকল্পনা ও ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের কর্মপরিকল্পনা ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

৭. উপরিউক্ত দুই পরিকল্পনার জেরক্স প্রতিলিপি ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে পাওয়া সম্ভব, নোডাল অফিসারের কাছ থেকে এই অনুমতি পাওয়া যায়নি।

৮. ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসারের এনজিও'র সরকারি কাজ নিয়ে প্রশ্ন করায় আপত্তি আছে।

৯. বর্তমান পর্যালোচনার উদ্দেশ্য জানার পরও এই উদ্যোগকে ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাননি।

ফলাফল :

পুরো বিষয়টি যদি আমরা অধিকারের ভিত্তিতে দেখি তাহলে রয়েছে দুটি পক্ষ – অধিকারের ধারক অর্থাৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও দায়িত্বপালক অর্থাৎ সরকার ও প্রশাসন।

অধিকার ধারক অর্থাৎ গ্রামীণ নাগরিকদের সাধারণভাবে কাজের অধিকার এবং নির্দিষ্টভাবে গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প সম্বন্ধে বিস্তারিত বা চলনসই সমস্ত ধারণার অভাব।

যেমন, জব কার্ড পাওয়ার পরেও যে লিখিতভাবে কাজের দাবি জানাতে হয় তা বেশিরভাগ মানুষ জানেন না।

দ্বিতীয়ত, এই প্রকল্প যে সংবিধান-সিদ্ধ, দয়াদাক্ষিণ্য নয়, সে সম্বন্ধে বোধের অভাব। যেমন, উল্লিখিত ১৮০৬টি পরিবার কাজের দাবি করেছেন তার মধ্যে ৭০৩টি পরিবারকে কাজের জন্য ডাকা হয়নি। কাজ দাবি করার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ না পেলে তাঁরা আইনত বেকারভাতা পেতে পারেন। বেকারভাতা তাঁরা পাননি এবং তা নিয়ে কোনও প্রতিবাদও করেননি।

তৃতীয়ত, সচেতনতার অভাব, অশিক্ষা বা পঞ্চায়েতের উপর নির্ভরতা—যে কোনও কারণেই হোক বহু ক্ষেত্রেই কাজের দাবির জন্য ৪(ক) ফর্ম-এ অনেকসময় আবেদনকারী তারিখ দেন না বা তাকে দিতে দেওয়া হয় না, পাছে আবেদনকারী বেকারভাতার জন্য আবেদন করে বসে।

চতুর্থত, বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ে কোন্ তারিখ থেকে কোন্ তারিখ পর্যন্ত কাজ চাইছেন তা একই ৪ (ক) ফর্ম-এ এককভাবে বা যৌথভাবে দরখাস্ত করতে পারেন তাও বহু আবেদনকারী জানেন না। যৌথ আবেদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ কমপক্ষে ১০ জন শ্রমিক আবেদন না করলে নতুন কাজ পঞ্চায়েত শুরু করতে পারে না।

পঞ্চমত, অধিকার ধারকের কিছু দায়িত্ব আছে। গ্রাম সংসদে কার্য-পরিকল্পনা যথাযথভাবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে) প্রস্তুত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার। প্রকল্পের এই কাজটির মধ্য দিয়ে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণের লক্ষ্যটিও অর্জিত হবে। কিন্তু কারা এটি নিশ্চিত করবে? গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন ২০০৫ এবং গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা স্কিম — ওয়েস্ট বেঙ্গল ২০০৬-এর সরকার কর্তৃক প্রণীত ব্যবহারিক রূপরেখা সেই বিষয়ে যথাযথভাবেই দিক নির্দেশ করেছে এবং

সেখানেই এসে যায় দায়িত্বপালক অর্থাৎ সরকার, প্রশাসন এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট ভূমিকা।

২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের কর্মসংস্থান তৈরির তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই পর্যালোচনা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ অক্টোবর ২০০৭ পর্যন্ত, পুরুলিয়া জেলায় নথিভুক্ত ৩২৪০৬৯টি পরিবারের মধ্যে জব কার্ড দেওয়া হয়েছে ৫৪৯৬৯টি পরিবারকে। জব কার্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রে সর্বস্তরে প্রশাসনিক গাফিলতি এর মধ্য দিয়ে ভীষণভাবে প্রকট। আবার দেখা যাচ্ছে যে ৫৪৯৬৯টি পরিবার জব কার্ড পেয়েছেন তার মধ্যে কাজের দাবি করেছেন মাত্র ৫০১টি পরিবার। এর মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পে যে কাজ দাবি করতে হয় সে ধারণা নাগরিকদের যে একেবারেই নেই তা পরিষ্কার। নাগরিকদের সচেতনতার অভাবের দায় দায়িত্বপালক সরকার ও প্রশাসন এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রশাসনের অপদার্থতার আরেকটি দিক ফুটে ওঠে যেখানে তা হল ৫০১টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ২০টি পরিবারকে কাজের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রোগ্রাম অফিসার স্তরে প্রশাসনিক গাফিলতি।

দিঘি পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের ২৫৫টি কাজের জন্য ২.২৬ কোটি টাকার কার্য পরিকল্পনা তৈরি করেছিল, যার মধ্যে দিয়ে তৈরি হবে ২৫০০০০ মানব দিবস। দেখতে পাচ্ছি দিঘি পঞ্চায়েতে নথিভুক্ত পরিবারের সংখ্যা ২৩৫৭। সুতরাং পরিকল্পিত মানবদিবস এমনভাবেই স্থির করা হয়েছিল যাতে, নথিভুক্ত সমস্ত পরিবারই ১০০ দিনের কাজ পেতে পারে। কাজেই কর্মপরিকল্পনা তৈরির দিক থেকে এটি আদর্শ কাজ হয়েছিল।

কিন্তু সমস্যা তৈরি হল এই কর্ম-পরিকল্পনার রূপায়ণ নিয়ে। কর্ম-পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যও একটা নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি প্রয়োজন। এই বিষয়টি শুধুমাত্র পঞ্চায়েত স্তরে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয় নয় বরং উচ্চতর প্রশাসনিক স্তরগুলোর এই বিষয়ে দায়িত্ব বেশি। বলা হচ্ছে এখানে ২৩৫৭টি পরিবার নথিভূক্ত হয়েছে। তা আদৌ ঠিক নয়। ২৩৫৭ নয়, আসলে ২৬৫৭টি পরিবার নথিভুক্ত হয়েছে এবং কমবেশি ৮৭১২ জন কাজের জন্য দাবি করেছেন এবং তাঁদের কাজ দেওয়া হয়েছে। ২৫৫টির মধ্যে ১৭টি কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে (১৭টির মধ্যে দুটি কাজ অল্প একটু বাকি আছে)। এই তথ্যটি আমরা জানতে পেরেছি দিঘি পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রী তন্ময় চন্দ্রের সঙ্গে ৩১ মার্চ ২০০৮ টেলিফোনের কথোপকথনের মাধ্যমে এবং দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত এই তথ্য প্রোগ্রাম অফিসারকে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার মোট ৭ শতাংশেরও কম কাজ রূপায়িত হয়েছে। সম্পূর্ণ কাজ বাস্তবায়িত হলে যে সম্পদ সৃষ্টি হত তা হল না। সম্পূর্ণ কাজ হলে, ৪% হারে যে কন্টিনজেন্সি তহবিলের প্রায় ১০ লক্ষ টাকা পাওয়া যেত তা গেল না। পয়সার অভাবে যে কাজগুলো সম্পূর্ণ হল না তাও বলা যাবে না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে কোনও কার্পণ্য করেন নি। তাহলে এইভাবে সমস্ত বিষয়টা যে

কয়েক ধাপ পিছিয়ে গেল তার দায় বর্তাবে কার ওপর ?

এছাড়াও উপরিউক্ত ঘটনা থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে কম্পিউটারে পরিকাঠামো এখনও গড়েই ওঠেনি, যদিও আমরা এই প্রতিবেদনেই জানিয়েছিলাম যে নভেম্বর মাসেই ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিস এবং ব্লকগুলোতে লোক নিয়োগের কাজ শেষ হয়েছে।

হতেই পারে যে প্রস্তুতিকালীন কিছু সময় লাগতে পারে। ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের সব কাজ যে শেষ হয়নি বিভিন্ন প্রস্তুতির অভাবে তাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। প্রথম দফাতেই যে জেলাগুলোতে কাজ শুরু হয়েছে পুরুলিয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরেও গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের রূপায়ণের এই হাল একমাত্র প্রশাসনের দায়বদ্ধতার ও সদিচ্ছার অভাবের দিকেই দিক নির্দেশ করে।

এবারে এক নজরে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এন আর ই জি ওয়েবসাইটের এস আই এস রিপোর্ট অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলার ৫৪৮৭৬টি জবকার্ডধারী পরিবারের মধ্যে ১৮০৬টি পরিবার কাজের দাবি করেছে, যাদের মধ্যে ১১০৩ জনকে কাজের জন্য লিখিত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে ৫১৭টি পরিবারের ৯৩৫ জন ৭৬০১ দিন কাজ করেছেন। অর্থাৎ আইনানুগভাবে একটি পরিবার গড়ে ১৫ দিনের মতো কাজ পেয়েছেন। যদিও দিঘি পঞ্চায়েতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে উপরিউক্ত একটি তথ্যও ঠিক নয়।

পুরুলিয়ার মতো একটি পশ্চাদপদ জেলা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী যে জেলায় গরিব গ্রামের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, সেখানে গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প রূপায়ণের এই অবস্থার জন্য একশোভাগ দায়ী জেলা এনআরআইজিএ নোডাল অফিস এবং সর্বস্তরের প্রশাসন। পুরুলিয়া জেলার মাননীয় নোডাল অফিসার কী বলবেন ? আমরা আপনার কৈফিয়ত দাবি করছি যে, এই ধরনের সামাজিক লোকসানের জন্য আপনার বিরুদ্ধে কেন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না ? এই বিষয়ে আমরা পুরুলিয়ার এনআরইজিএ-র ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরেরও বক্তব্য দাবি করছি, যিনি পুরুলিয়া জেলায় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নিযুক্ত।

শুধু পুরুলিয়া জেলায় নয়, সমগ্র রাজ্যেও এই প্রকল্প রূপায়ণের অবস্থাটিও খুবই সঙ্গীন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইনানুগভাবে ৪৮০২৪১টি গ্রামীণ পরিবার ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে গড়ে ১১ দিন কাজ পেয়েছে যা একেবারেই হতাশাজনক।

কাজের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে, যে আইন যা চালু করার জন্য বামপন্থীরা দরাজ গলায় নিজেদের কৃতিত্ব দাবি করেন, তার রূপায়ণে বামপন্থী শাসিত পশ্চিমবঙ্গে এই অবস্থা কেন ? বামফ্রন্ট সরকার কি এই প্রকল্প রূপায়ণে আদৌ উৎসাহী নন ? রকমসকম দেখে মনে তো তাই হয়। আসলে সরকার

ও প্রশাসনের সর্বত্রই একটা গয়ংগচ্ছভাব।

যদিও আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ পুরুলিয়া জেলাতেই, কিন্তু সরকারি কার্যনির্বাহের ধারাটি সর্বত্রই এক। দায়বদ্ধতার লেশমাত্র নেই। শাস্তিবিধানের বন্দোবস্ত যদিও এই আইনে কিছু নেই, কিন্তু প্রশাসনের গাফিলতির একটা পর্যালোচনা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। এটা সত্যিসত্যিই একেবারেই অবোধ্য যে, বামফ্রন্ট সরকার এরকম দারিদ্র দূরীকরণে সাহায্যকারী একটি প্রকল্পের রূপায়ণে যথেষ্ট জোর দিচ্ছে না কেন? বামপন্থী দলগুলোরই বা ভূমিকা কী? তারাও এই প্রকল্পকে সফল করে তোলার জন্য তাদের কৃষক এবং যুব সংগঠনগুলিকে কাজে লাগাচ্ছেন না কেন?

এই প্রকল্প সম্বন্ধে একটি ইতিবাচক ভাবনা না থাকলে এই প্রকল্প কোনোদিনই সাফল্য লাভ করবে না। সরকারই পারেন, একে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে। আমরা এনজিও এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী এবং নাগরিক সংগঠনরা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে একশোভাগ রাজি। সরকার কি আমাদের সাহায্য নেবেন? ◻

কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ও উত্তর দিনাজপুর

শঙ্করকুমার রায়

জীবন সুরক্ষা আর সুনিশ্চিত জীবিকা — বস্তুত একটি তারে বাঁধা বিভিন্ন সময়ের অখণ্ড সুর। এই জীবন-জীবিকা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের স্বপ্নের যোজনা 'ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট' (এনআরইজিএ) ২০০৫ থেকে চালু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

কিন্তু তিন বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। দুঃখজনক হল, খোদ সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এই রাজ্যে মেরেকেটে মাত্র বারো দিন কাজের সুযোগ হয়েছে। যেখানে এনআরইজি ১০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে বলেছে সারা বছরে। এই দৃশ্য আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে। যার পরিণতির জেরে নিয়ত মর্মান্তিক মাসুল গুনছেন প্রত্যন্ত পরিবারগুলো।

উত্তরবঙ্গের সবচাইতে পিছিয়ে পড়া জেলা উত্তর দিনাজপুর। এই জেলায় প্রকল্পটির ২০০৬-এর মাঝামাঝি প্রয়োগ শুরু হয়। এখনো পর্যন্ত কোনো মজুর টেনেটুনে, আট দিনের বেশি কাজ জোটাতে পারেননি। কাজ না পাওয়ার ফলে তাঁরা বাঁচার তাগিদে ভিন রাজ্যে প্রতিদিন পাড়ি জমাচ্ছেন। এই অমোঘ তথ্য মেনে নিয়েও, সামান্য বিচলিত হন না এই জেলার সরকারি আধিকারিকবৃন্দ।

পাশাপাশি, এই প্রকল্প রূপায়ণে পঞ্চায়েতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে চরম অবহেলার টুকরো টুকরো দৃশ্য রয়েছে এই জেলার গ্রামগুলোতে। এনআরইজিএস-এর জব কার্ড তৈরি থেকে শুরু করে কাজ

বাছাই, মজুরি প্রদান ইত্যাদি প্রতি স্তরে যারপরনাই গরমিলের অভিযোগ পঞ্চায়েতগুলোয় রোজকার ঘটনা। প্রকল্পটির মাধ্যমে তিন শ্রেণির মজুরির কথা নথিভুক্ত রয়েছে– অদক্ষ শ্রমিক ৭৫ টাকা, অর্ধদক্ষ শ্রমিক ১২০ টাকা এবং দক্ষ শ্রমিক ১৫০ টাকা। আইনত বরাদ্দ থাকলেও, এখানে মজুরদের জুটেছে শুধু অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি। আবেদনপত্র জমা দেবার দুই সপ্তাহের মধ্যে নির্দিষ্ট পঞ্চায়েত কাজ দিতে না পারলে, প্রকল্পের নিয়মানুসারে বেকারভাতার উল্লেখ রয়েছে। অথচ অবাক করা ঘটনা হল, এই জেলার ৯৮টি পঞ্চায়েতের কেউ আজ পর্যন্ত কাজ না পেয়ে, বেকারভাতার কানাকড়িও হাতে পাননি। এমনকি, তার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কেউ কোনো লিখিত অভিযোগও জানাননি।

অন্যদিকে, গ্রামের পরিবার পিছু যে জব কার্ড মজুরদের হাতে থাকার নিয়ম, তা এ জেলার অধিকাংশ পঞ্চায়েত সদস্যদের হেফাজতে রয়ে গেছে। এই ব্যাপারে প্রত্যন্ত গরিব মানুষ কান্নাকে বুকে চেপে কার্যত দিন কাটান। এই বিষয়ে জেলার শাসক—বিরোধী দল বস্তুত নির্বিকার।

এইদিকে এই প্রকল্পে দুর্নীতি ঠেকাতে, জব কার্ডপ্রাপ্ত মজুরদের পঞ্চায়েত অফিসের পরিবর্তে ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মজুরি প্রদানের কাজ, চলতি আর্থিক বছর থেকে শুরু হয়েছে। তবে কর্মদিবস বাড়েনি। বরং ২০০৮ সালের মে মাস থেকে এই জেলার ইসলামপুর মহকুমার অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে, এই প্রকল্পের কাজ পুরো থমকে পড়েছে। অত্যন্ত ঢিমে গতিতে কাজ চলছে রায়গঞ্জ মহকুমার চারটি ব্লকে। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধানদের বক্তব্য, আদতে গ্রামে বিশেষ কাজ নেই। তবে উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক সুকুমার ভট্টাচার্যের (আইন অনুযায়ী তিনিই প্রকল্পের জেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর) গলায় ভিন্ন সুর। তিনি সোজাসাপ্টা ভাষায় বলেন, ''কাজের অভাব নেই, কিন্তু কাজ করার মানসিকতার বড্ড অভাব''। অথচ পঞ্চায়েতের মানুষ দলে দলে এই প্রকল্পের কাজ পাওয়ার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু পঞ্চায়েত অফিস কার্যত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন বলে প্রায় প্রতিদিন বিস্তর অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

ফলে, ইসলামপুর মহকুমার গোয়ালপোখর ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ সংসার সামলাতে নিজেদের ভিটা ছেড়ে পানিপথ, হরিয়ানা, দিল্লি, মুম্বই, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি দূর এলাকায় ছুটে যেতে কার্যত মরিয়া।

অথচ গত ২০০৭ আর্থিক বছরে, এই জেলার সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকার বেশি জেলা দফতরে জমা পড়েছিল, খরচ হয়েছে সরকারি হিসেবে ২২ কোটি টাকার সামান্য বেশি। বাকি টাকার কাজ দেওয়া যায়নি।

কর্মসংস্থান যে সরকারের সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ, তা নিয়ে সামান্য সংশয় নেই। আর তার জন্য স্বয়ং সরকারি দায়িত্বে থাকা কর্মীদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বদ্ধ ঘরগুলো হাট করে খোলাটা অত্যন্ত জরুরি। তাহলে প্রত্যন্তে না খেতে পাওয়া, অপুষ্টিতে ভোগা মানুষগুলো অনেক বেশি ঋদ্ধ হত। ◻

একশো দিনের কাজে নতুন দিশা

NREGS কাজের উপযোগী ডিআরসিএসসি মডেল নিয়ে সমীক্ষা

এনআরইজিএ (NREGA) হল জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (২০০৫) যেটি ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকারী হল। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতের ২০০টি সর্বাধিক অনগ্রসর জেলায় আইনটি বলবৎ করা হয়। উদ্দেশ্য হল, প্রতি আর্থিক বছরে যে সমস্ত গ্রামীণ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ কায়িক শ্রম করতে ইচ্ছুক, সেই সমস্ত পরিবারগুলিকে কমপক্ষে ১০০ দিনে কাজ দেওয়ার মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলির জীবিকার নিশ্চয়তা বৃদ্ধি এবং পাশাপাশি প্রকল্পের অন্য উদ্দেশ্যগুলি হল :

- গ্রামে স্থায়ী উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি
- পরিবেশ রক্ষা
- রোজগারের জন্য গ্রাম ছেড়ে যাওয়া বন্ধ করা
- সামাজিক সক্ষমতা গড়ে তোলা
- গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতা বাড়ানো

এনআরইজিএ অন্যান্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কারণ, এটি একটি আইন যে আইনের উদ্দেশ্য কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিয়ে গ্রামের মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা।

এনআরইজিএ-র বৈশিষ্ট্যসমূহ: ভারতে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির মধ্যে এনআরইজিএ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে ২০০৫ সালে সমগ্র প্রকল্পটির আর্থিক মূল্য জিডিপি-র ২% ছিল। এই বৃহৎ প্রকল্পটিকে নির্বিঘ্নে সম্পাদনা করা ও তার উপযোগিতা উদ্দিষ্ট জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে, আইনটির প্রধান দিকগুলি জানা দরকার।

- অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী গ্রামীণ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা বিনামূল্যে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে মৌখিক বা লিখিতভাবে নথিভুক্তি করার জন্য আবেদন করবেন।
- গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করার পর, আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে জব কার্ড প্রদান করবে।
- জব কার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্মসংস্থানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে লিখিত আবেদন জমা দিতে পারে। কাজের আবেদন কমপক্ষে একটানা ১৪ দিনের হতে হবে এবং সপ্তাহে ৬ দিনের বেশি নয়
- আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দেওয়া না হলে আইন অনুসারে আবেদনকারী বেকারভাতা পাবে
- সর্বনিম্ন মজুরি আইন অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হবে এবং পুরুষ মহিলা উভয়ই সমান মজুরি পাবে
- মোট পুঁজির চল্লিশ শতাংশ প্রকল্পের

সাজসরঞ্জাম-এর ওপর খরচ করা হবে এবং ৬০% অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির জন্য ধার্য করা হবে।

- মোট খরচ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ৯০ঃ ১০ অনুপাতে ভাগ করে নেবে। উপকরণের খরচ ৭৫ঃ২৫ অনুপাতে ভাগ হবে
- কোথাও ঠিকাদার মারফত কাজের অনুমোদন নেই।
- এই প্রকল্পের কাজগুলি শ্রমনির্ভর। মেশিনের কোনোরকম ব্যবহার নেই।
- আবেদনকারী যে গ্রামে বসবাস করে তার ৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে তাকে কাজ দিতে হবে। তা না হলে মজুরির ১০% অতিরিক্ত ভাতা হিসাবে দিতে হবে।
- প্রকল্পটির অধীনে নতুন কাজ আরম্ভ করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন শ্রমিক জোগাড় করতে হবে।

NREGA প্রকল্পের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ডিআরসিএসসি গবেষণামূলক কাজ শুরু করেছে। এই গবেষণার প্রথম উদ্দেশ্য হল এই সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে ডিআরসিএসসি'র দলগত সম্পদ তৈরির মডেলগুলি কার্যকারী কিনা তা দেখা। গবেষণার অপর উদ্দেশ্য হল, ডিআরসিএসসি দ্বারা প্রস্তাবিত এবং ব্যবহৃত ভাল মডেলগুলির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা যাতে সেগুলোকে গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে উপস্থাপন করার মাধ্যমে NREGA প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। এককথায় বলতে গেলে ডিআরসিএসসি'র উদ্দেশ্য NREGA'র মডেলগুলির কাঠামোর সামান্য পরিবর্তন করে তাকে জেলার উপযোগী করে তোলা, যাতে জনসমাজের সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হয়।

গবেষণার জন্য ডিআরসিএসসি আবহাওয়া ও জীব জগতের ভিত্তিতে তিনটি জেলা নির্বাচন করেছে যাতে নানান পরিস্থিতিতে NREGA প্রকল্পের উপযোগিতা বুঝতে সুবিধা হয়। জেলাগুলি হল :

- বীরভূম : খরা এবং বন্যাপ্রবণ একইসঙ্গে
- পুরুলিয়া : খরা প্রবণ
- উত্তর ২৪ পরগনা : বন্যাপ্রবণ

মডেল সমীক্ষা

বীরভূম

ধাপপুকুর

গ্রামে পুকুর জলের প্রধান উৎস। পুকুরের জল–ঘরের কাজ, হাঁস পালন ও মাছচাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। গ্রামীণ জীবনে পুকুরের গুরুত্ব মাথায় রেখে NREGA প্রকল্পের কাজের একটি হল জল সংরক্ষণ ও জল সঞ্চয়। কিন্তু ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের কারণে এই বামুনিবহাল গ্রামের পুকুর উপযুক্ত/ রক্ষণযোগ্য নয়। এই অঞ্চলে NREGA প্রকল্পকে পুর্নগঠন করে ডিআরসিএসসি ধাপ পুকুর নির্মাণ করেছে। সাধারণ পুকুরে একটিমাত্র তল থাকে। ধাপ পুকুর হল একটি সাধারণ পুকুর যার দেওয়াল ধাপ কাটার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং পুকুরটি বহুতল বিশিষ্ট। শুষ্ক অঞ্চলে পুকুর বেশি বাষ্পীভবন প্রবণ তাই পুকুরের দেওয়ালে ধাপ থাকলে জল ওপরের ধাপ থেকে বাষ্পীভূত হলেও নীচের স্তরগুলি জলপূর্ণ থাকবে।

ডিআরসিএসসি'র উদ্দেশ্য NREGA'র মডেলগুলির কাঠামোর সামান্য পরিবর্তন করে তাকে জেলার উপযোগী করে তোলা, যাতে জনসমাজের সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হয়।

এই অঞ্চলের মানুষ প্রধানত কৃষক। অধিকাংশ জমিতে ফলন কম। চাষ বর্ষানির্ভর। পুকুর থাকলেও মার্চ মাসের মধ্যেই জলস্তর নেমে যেত। পুকুরের লাগোয়া জমি পাথুরে। তাই পুকুরে মাছচাষও সম্ভব ছিল না।

এই অঞ্চলে ডিআরসিএসসি গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করে পুকুরগুলিকে ধাপপুকুর করতে। এই পুকুরের জল চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়। গরমকালে ওপরের ধাপগুলিতে সবজি বাগান করা হয়। নীচের ধাপের জল সবজি বাগানের জলের চাহিদা মেটায়। এই বাগান মাছের খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে নীচের স্তরগুলিকে মাছচাষের উপযোগী করে তোলে। পুকুরের পাড় গাছ লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। পাড়ে বাবলা, টকট্যাড়শ, টম্যাটো, বেগুন, অড়হর, সোনাঝুরি ও জ্বালানির জন্য শিরীষ লাগানো হয়েছে।

মাছ, সবজি ও জ্বালানি বিক্রি করে গ্রামবাসীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পুকুর সংস্কার, সবজি বাগান, মাছচাষ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যেমন শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে তেমনই জলসম্পদও সৃষ্টি হয়েছে।

খাদ্য বন

বীরভূম জেলার খোসকদমপুর। মানুষজনের কোনো স্থায়ী আয়ের উৎস নেই। NREGA প্রকল্পের অধীন রাস্তা নির্মাণ, পুকুর খনন, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সাময়িক কিছু আয় হলেও কোনো লক্ষণীয় সম্পদ সৃষ্টি হয়নি। এই অঞ্চলে ডিআরসিএসসি এই ধরনের বনের ধারণাটির প্রবর্তন করেন। গ্রামবাসীরা একটি দল গঠন করে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে পুকুর সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত জমি ২০ বছরের জন্য লিজ নেন। পুকুরটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং জমিটি পঞ্চায়েতের। দল ও পঞ্চায়েতের মধ্যে চুক্তি হয় যে প্রকল্পের লাভ ৭৫ঃ২৫ অনুপাতে দল ও পঞ্চায়েতের মধ্যে ভাগ হবে। ডিআরসিএসসি পুকুর সংস্কারের জন্য ১০,০০০ টাকা এবং বন তৈরির জন্য ২২,০০০ টাকা সাহায্য করে। বর্তমান পুকুরটি সেচকার্যের প্রধান উৎস এবং পুকুর সংলগ্ন জমিতে বিভিন্ন গাছ যেমন বেদানা, কালোজাম, বেগুন, ট্যাড়শ লাগানো হয়েছে। পুকুরে হাঁসপালন ও মাছ চাষ ইত্যাদি হচ্ছে। গাছ মাটির উর্বরতা রক্ষায় সাহায্য করছে। এই বন গ্রামবাসীদের খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে পশুখাদ্য ও

ধাপপুকুর

শ্রমদিবস	মজুরির হার	মোট মজুরি	সাজসরঞ্জাম	মোট খরচ
১৯৫০	৬৮	১৩২৬০০	-	১৩২০০০

দলের দেওয়া তথ্য

খাদ্যবন

শ্রমদিবস	মজুরির হার	মোট মজুরি	কাঁচামাল	মোট খরচ
২৮৫৬	৭০	১৯,৯২০	৩৫.০০০	২,৩০.৫০০

দলের দেওয়া তথ্য

জ্বালানির চাহিদা মেটাচ্ছে। নিজেদের ভাগের পর অতিরিক্ত মাছ ও হাঁসের ডিম বিক্রির মাধ্যমে গ্রামবাসীদের আয় বাড়ছে। দল লাভ থেকে ডিআরসিএসসি-র ধার শোধ করবে। এভাবে এখানে গ্রামবাসীরা স্থায়ী আয়ের উৎস ছাড়াও খাদ্যবনরূপী একটি জনসম্পদের মালিক হয়েছেন।

পুরুলিয়া

সামাজিক বনসৃজন

এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে ২৫-৩০ বছরের জন্য জমি লিজ নিয়ে ডিআরসিএসসি'র দেখানো পথ অনুযায়ী যে সমাজমুখী বনসৃজনের কাজ হচ্ছে এই জেলায় জমির ঢাল বেশি (খাড়াই) হওয়ায় মৃত্তিকার ক্ষয়ও বেশি। তাই এই অঞ্চলে সমাজমুখী বনসৃজনের প্রধান উদ্দেশ্য হল, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মৃত্তিকা সংরক্ষণ এবং মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি। বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে NREGA প্রকল্পে পঞ্চায়েত বাবলা, সোনাঝুরি, ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানোর ওপর জোর দিত। কারর হল, এগুলি বিক্রি করে দ্রুত লাভ পাওয়া সম্ভব এবং গরু ছাগল এইসব গাছ খেতে পারে না বলে, রক্ষণাবেক্ষণের খরচও খুব কম।

ডিআরসিএসসি NREGA প্রকল্পটির সামান্য পরিবর্তন করে, গ্রামবাসীদের বাবলা ও ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁকে ফাঁকে নানা প্রজাতির গাছ লাগানোর উপদেশ দেয়। এর ফলে জমির উর্বরতা বজায় থাকবে। বর্তমানে, সেগুন, তুলো, শিশু, সুবাবুল প্রভৃতি ৩২-৩৭ রকমের গাছ লাগানো হয়েছে। ভবিষ্যতে গ্রামবাসীরা অড়হর, বাবুই ও সবজি লাগাতে ইচ্ছুক। এছাড়াও ডিআরসিএসসি প্রস্তাব অনুযায়ী গাছগুলির মধ্যে মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার বাঁধ দেওয়া হয়েছে, যাতে জল বয়ে নীচে চলে না যায় এবং গাছগুলি জল পেতে পারে। যদিও ১৫-২০ বছরের আগে এই প্রকল্পের উপযোগিতা বোঝা নয়। কিন্তু বর্তমানে এই ধরনের বন মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করা ছাড়াও গ্রামবাসীদের পশুখাদ্য ও জ্বালানি দেয়। গাছ কেটে বিক্রি করেও গ্রামবাসীরা আয় করেন এবং তিন বছর পর পর গাছের পাতা বিক্রি করে গাছ প্রতি ৫০ টাকা আয় হয়। বাবুই দড়ি বিক্রি করে ১২-১৫ টাকা দড়ি পিছু আয় হয়। এছাড়াও বনসৃজনের কাজ ৭৮০০ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ডিআরসিএসসি টাকা দিলেও, এখন দল তাদের লাভ থেকে ধার শোধ করেছে এবং গরুর গাড়ি কেনা, ক্লাবঘর নির্মাণ ও সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে। এখন আর তারা টাকার জন্য মহাজনের উপর নির্ভরশীল নয়।

আর একটি দিক হল তসরগুটি পালন, নির্দিষ্ট সময়ে গুটিপোকা থেকে তসর পাওয়া যায়। তসরচাষ গ্রামবাসীর আয়ের উৎস। কিন্তু ১০০০ কেজি তসর বিক্রি করে গ্রামবাসীরা মাত্র ৫০০-৭০০ টাকা পান। লাভের মূল অংশটা চলে যায় দালালদের হাতে। তাই ডিআরসিএসসি গ্রামবাসীদের এক মাসের তসর পালনের প্রশিক্ষণ দেয়, যাতে তাঁরা নিজেরাই সুতো তৈরি করে সরাসরি বাজারে বিক্রি করতে পারে। গ্রামবাসীরা ইউক্যালিপটাস বা সোনাঝুরির বদলে অর্জুন ও কুল গাছ লাগাচ্ছেন, কারণ এগুলি গুটিপোকা প্রতিপালনের পক্ষে উপযোগী এবং পোকা নিঃসৃত বর্জ্য সংলগ্ন মৃত্তিকাকে উর্বর করে তোলে। অর্জুন গাছের

গ্রামবাসীদের বাবলা ও ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁকে ফাঁকে নানা প্রজাতির গাছ লাগানোর উপদেশ দেয়। এর ফলে জমির উর্বরতা বজায় থাকবে

কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রেশম গুটিচাষ একটি আয়সৃষ্টিকারী মডেল যা দীর্ঘকালীন উপজীবিকা সৃষ্টি করে। সমাজমুখী বনসৃজনে চারাগাছ তৈরি, গর্ত খোঁড়া, গর্ত তৈরি (জৈব সার, কম্পোস্ট সার), বৃক্ষের সুরক্ষার ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়। এই মডেলটি থেকে খাদ্য, জ্বালানি, পশুখাদ্য, মাটি সংরক্ষণ, পরিবেশ ইত্যাদি উপকার পাওয়া যায়।

RLI

RLI তৈরি হয়েছে ভালুকগাজার গ্রামে। এখানের জমি পাথুরে। বৎসরব্যাপী জলের স্বল্পতার সমস্যা এখানে ভীষণ। এখানকার কৃষকেরা বছরে একটিমাত্র ফসল ধান ফলান।

এই অঞ্চলের কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য ডিআরসিএসসি রিভারলিফট সেচ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে। এই অঞ্চলের কৃষি জমি দ্বারকেশ্বর নদী সংলগ্ন। ডিআরসিএসসি গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি দল গঠন করে। যারা দ্বারকেশ্বর নদীর কাছে ২৬ ফুট গভীর একটি কুয়ো খনন করে। (প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটির আনুমানিক খরচ ২.৫ লাখ টাকা হলেও খনন শেষে প্রকল্পের প্রকৃত খরচ ৩.৩৮ লাখে দাঁড়ায়। জমি পাথুরে হওয়ার কারণে প্রকল্পের খরচ ঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভব হয়নি।)

কাজ শেষ হওয়ার পর পাম্পের সাহায্যে কুয়োর জল তুলে, সংলগ্ন জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাম্প চালানোর জন্য দলের প্রতি সদস্যকে ঘণ্টা প্রতি ১০ টাকা দিতে হয়। ৫ টাকা মোটর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং ৫ টাকা জমি ও পাম্পের পাহারার জন্য। ডিআরসিএসসি কৃষকদের মিশ্রচাষ করতে উপদেশ দেয়। কৃষকেরা এখানে অতীতের মতো শুধু ধানচাষ না করে একইসঙ্গে দুটি শস্য ফলান। যেমন গম-সরষে, মটর-সরষে, আলু-মেথিশাক—এর ফলে একটি শস্য নষ্ট হলেও অন্যটি থেকে বেশি আয় করতে পারে। বাইরের কৃষকদের জল ব্যবহার করতে দিলে দল ২০ টাকা নেয়। এই প্রকল্পে মোট ১৬০০ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে এবং কাজ করা কালীন কৃষকরা প্রতিদিন ৫০ টাকা করে রোজগার করেছে। ২০০৭ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এখন ৭০-৮০ বিঘে পর্যন্ত সেচ করা যাচ্ছে। দল বিশ্বাস করে ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের সাহায্যে তারা ৪০০ বিঘে পর্যন্ত সেচ করাতে পারবে। অন্যান্য ভূমিহীনদের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার আশাও দল পোষণ করে।

NREGA প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল রক্ষণীয় সম্পদ সৃষ্টি এবং সম্পদ সৃষ্টি কালীন শ্রমদিবস এবং গ্রামবাসীদের জন্য আয়ের উৎস সৃষ্টি করা। কিন্তু NREGA প্রকল্পগুলি আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করেছে। অন্যদিকে ডিআরসিএসসি গ্রামে কিছু মডেল সৃষ্টি করেছে NREGA মডেলগুলি সামান্য পরিবর্তন করে বা সম্পূর্ণ নতুন মডেলের সাহায্যে। NREGA ও ডিআরসিএসসি মডেলগুলির তুলনামূলক সমীক্ষা করে কোন্ প্রকল্পটি উন্নততর তা নির্ধারণ করা সম্ভব।

প্রযুক্তিগত : NREGA মডেলগুলি প্রয়োগ করার সময় প্রযুক্তিগত দিকগুলি

বিবেচনা করা হয়নি। NREGA'র পুকুর খনন প্রকল্পের অধীন বহু পুকুর প্রথম দু-একবছর পর অনুৎপাদক হয়ে যায়, প্রযুক্তির কারণে। প্রকল্পটির সামান্য পরিবর্তন করে ডিআরসিএসসি'র ধাপ পুকুর, পুকুরের রক্ষণযোগ্যতা ও আয় সৃষ্টির বিকল্প উপায় সহজেই তৈরি করতে পারে।

অর্থনৈতিক দিক : NREGA প্রকল্পগুলি (রাস্তানির্মাণ, পুকুর খনন) সুপরিকল্পিত হলে তা জনসমাজের উপকারে লাগে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে খুব কার্যকারী নয়। প্রকল্পগুলি থেকে কোনো রাজস্ব বা আয় সৃষ্টি হয় না এবং কয়েক বছর পর প্রকল্পগুলি কাজ ফিরে নতুন করে করতে হয়, যার জন্য আবার অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ ব্যবহার করতে হয়। অন্যদিকে ডিআরসিএসসি'র প্রস্তাবিত মডেলগুলি প্রারম্ভের কয়েক বছরের মধ্যেই অর্থনৈতিকাবে সুস্থিত হয়ে ওঠে। খাদ্যবনের মডেলটি দু বছরের মধ্যেই পরিণত হয়ে উঠেছে এবং দলের সদস্যদের জন্য আয় সৃষ্টি করছে।

পরিবেশগত দিক : কোনো প্রকল্পে NREGA-এর অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে, তার ন্যূনতম মাপকাঠি হল প্রকল্পটির কোনো কুপ্রভাব থাকবে না, বিশেষত পরিবেশের ওপর। কিন্তু পুরুলিয়ার NREGA-এর সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে ইউক্যালিপটাস গাছের ব্যবহার মৃত্তিকার উর্বরতা নষ্ট করছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে ডিআরসিএসসি মডেলগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল পরিবেশ রক্ষা। তাই খাদ্যবন প্রকল্পে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছে। খাদ্যবন, ধাপপুকুর, নার্সারি শ্রমদিবস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী সম্পদও গড়ে তুলেছে। যেগুলি গ্রামবাসীদের কাছে স্থায়ী আয়ের উৎস হিসেবে তৈরি হয়েছে। ◘

ভাষান্তর : **রণিতা ব্যানার্জী**

প্রবন্ধটি গুজরাটের মুদ্রা ইনস্টিটিউট অফ কমিউনিকেশন এর ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্র - গবেষণার ভাষান্তরিত লেখাসংক্ষেপ।

দুর্যোগ মোকাবিলায় NREGS

অংশুমান দাশ

১০০ দিনের কাজ কোথাও কোথাও ২৫ দিন, কোথাও কোথাও ৪ দিন। কাজ নেই বা কাজ করার লোক নেই—এটা বেশ মুখরোচক তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় হতে পারে। তর্ক হতে পারে, কেন গরিব মানুষের কেবল গায়ে গতরে খাটা (পড়ুন পরিকল্পনাহীন মাটিকাটা) ছাড়া আর কোনও দক্ষতাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে রোজগারের অধিকারকে সুনিশ্চিত করা হবে না। দাবি উঠতে পারে—কেন কেবল ১০০ দিন, বাকি ২৬৫ দিন ভূমিহীন মজুররা কি না খেয়ে থাকবেন? গ্রামে কী কাজ হবে সেটা কেনই বা ঠিক হবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। যেখানে কথা ছিল—গ্রামে এমন কিছু Prouctive Asset তৈরি হবে যা ভবিষ্যতেও জীবিকার জোগান দেবে, সেখানে অপরিকল্পিত মৃত্তিকা উত্তোলনে পরিকল্পনাকারীদের উর্বর মস্তিষ্ক সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। অবশ্য আমাদের মতো নিন্দুকদের এত কটু কথা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, এই NREGA নানা ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি করেছে।

এই লেখা যখন লিখছি, তখনও পর্যন্ত আয়লার ত্রাণ সমস্ত জায়গায় পৌঁছায় নি (এমন কি সমস্ত মৃত্যু-ধ্বংস-ক্ষতির খবর আনতেও সাংবাদিকরা ভয় পাচ্ছেন)। অথচ এই রাজ্যে নাকি ব্লকস্তর পর্যন্ত দুর্যোগ প্রতিরোধ বিষয়ক ব্যবস্থা আছে! সাম্প্রতিক জলবায়ুর পরিবর্তন (Climate Change) জনিত কারণেই হোক অথবা অন্যান্য কারণে, দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা বেড়েই চলেছে। আগামী দশকগুলিতেও এই প্রকোপ কমার কোনো আশা দেখিনা। NREGA প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য কিছু পদক্ষেপ কি নেওয়া যায়না?

- আগের জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নদীবাঁধ তৈরি এবং সেগুলিতে গাছপালা লাগিয়ে শক্তপোক্ত করা
- লবণাম্বু গাছ রোপণ
- বন্যার সময় আশ্রয় নেওয়া যায় এরকম উঁচু জায়গা বানানো, যাতে ফল-গোখাদ্য-জ্বালানির গাছ থাকবে, যা অন্তত ২-৩ দিন বাঁচার রসদ জোগাতে পারে
- বন্যার জলের সংস্পর্শ থেকে বাঁচানোর জন্য কিছু পুকুর চিহ্নিত করে তার পাড়গুলি উঁচু করা
- উ.দ. ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় রিলিফ ক্যাম্পের জন্য জায়গা তৈরি করা, সেখানে পৌঁছানোর রাস্তা বানানো
- বৃষ্টির জল ধরে রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা
- খরাপ্রবণ অঞ্চলের মানুষের চাষের দিন বাড়ানোর জন্য মাটি ও জল সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি প্রয়োগ
- সামাজিক বনায়ন। আবহাওয়া উপযোগী, চাহিদা অনুযায়ী গাছ লাগানো, শুধু ইউক্যালিপটাস ও সোনাঝুরি নয়।

মাথা ঘামালে এরকম আরও অনেক কিছু পরিকল্পনা আসতে পারে। যাতে কাজের দিনেরও সৃষ্টি হবে এবং ভবিষ্যতে সুবিধা হবে দুর্যোগ মোকাবিলার। অনেকে বলতে পারেন—এ আর নতুন কী? সবই তো হচ্ছে। হচ্ছে, কিন্তু আলাদা আলাদা দফতরের আওতায়। হচ্ছে, কিছু জায়গায় নমো নমো করে। দরকার সমন্বয়। দরকার সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নের ম্যাপিং, যাতে দুর্যোগ মোকাবিলাকে Cross cutting issue হিসাবে পরিগণিত করা হবে। আর দরকার ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অতীতের শিক্ষাকে বর্তমান পরিকল্পনার অন্তর্গত করা।

অদূর ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগই আমাদের প্রধান শত্রু হতে পারে। এবার প্রকৃতির প্রতিশোধের পালা। ◻

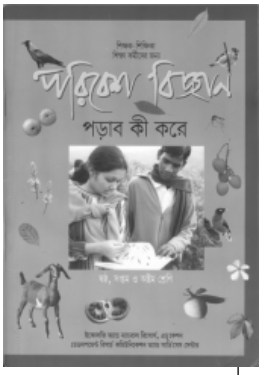

স্কুলস্তরে পরিবেশ পাঠে সহায়ক এই বই। পরিবেশ-যত্ন শেখাবে হাতেকলমে। প্রকৃতি-রক্ষা - প্রকৃতি লালন ও উষ্ণায়ন নিয়ে সচেতন করবে ভাবী প্রজন্মকে। ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির উপযোগী।

তথ্যের অধিকার আইন'০৫ সরকারি দফতরে তথ্য চাওয়ার আইন। তথ্য না পেলে নালিশ করার আইন। কিন্তু কোথায় আবেদন করব, কীভাবে করব, তথ্য না পেলে কী করব, এসব নাড়ীনক্ষত্র-বিন্দুবিসর্গ বিশদে বলা আছে এই বইতে। সঙ্গে আছে রাজ্যস্তরে আবেদন যাঁদের পাঠাবেন ও এই কাজে যাঁরা আপনাকে সাহায্য করতে পারে সেই সব সংগঠনের তালিকা।

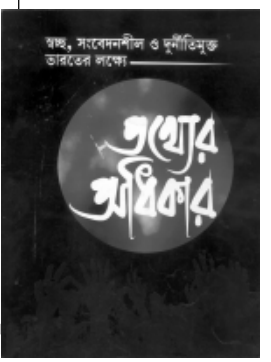

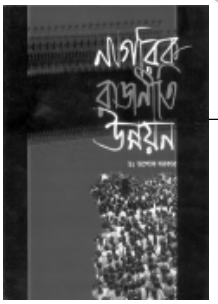

নাগরিক সমাজ-এনজিও ও আর্থ-সমাজের টানাপোড়েন। টানাপোড়েনের কেন্দ্রে রাষ্ট্র ও রাজনীতির অভিঘাত। এই সমগ্র রসায়নের নতুন ভাষ্য এই বইতে। গড়ে ওঠা ভাবনাদর্শের প্রতীতি-প্রত্যয় ও বীক্ষার নিবিড় পাঠ।